গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত
৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৬৭

দেড় টাকা]

প্রিণ্টার—শ্রীকিশোরী মোহন মণ্ডল
নবগৌরাঙ্গ প্রেস
১০৪, আমাহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পরম স্নেহময়ী

মাতৃঠাকুরাণীর

শ্রীচরণোদ্দেশে

"স্বর্গে নহে, আমাদের অতি কাছাকাছি
আছ তুমি হে তাপস, তাই মোরা যাচি
তব বর, শক্তি তব, জেনেছিলে তুমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী এই বঙ্গভূমি !
দিলে ধর্ম, দিলে কর্ম, দিলে ধ্যান জ্ঞান,
তবু সাধ মিটিল না , দিলে বলিদান
আত্মারে জননী পদে, হাঁকিলে, "মাভৈঃ !
ভয় নাই, নব দিনমণি ওঠে ওই !
ওরে জড়্, ওঠ্ তোরা !" জাগিল না কেউ,
তোমারে লইয়া গেল পারাপারী ঢেউ !"

—নজরুল ইসলাম

সূচনা

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে ১৯০৮ সালের ২১শে নভেম্বর শনিবার এক স্মরণীয় দিন। এদিন অগ্নিযুগের অন্যতম প্রবর্তক সত্যেন্দ্রনাথ দেশের জন্য ফাঁসির মঞ্চে প্রাণাহুতি দেন।

দেশদ্রোহীকে এর আগেও হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এমন যোগাযোগ আর কোন দেশে হয়েছে কিনা জানা যায় না।

বিদেশী রাজশক্তির বিশেষভাবে সুরক্ষিত সু-উচ্চ দেয়াল-ঘেরা কারাগারের মধ্যে পিস্তল গলিয়ে, যশখ্যাতি মান-মর্যাদা বিপন্ন করে রাজসাক্ষীর অভিনয় করে দেহরক্ষীকে ফাঁকি দিয়ে 'রাজসাক্ষী'কে হত্যা করার নজীর কোন দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে আছে কিনা সন্দেহ।

আদর্শ বিপ্লবীর পক্ষে যা করণীয় তাঁর সারা বৈপ্লবিক জীবনে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করেও তিনি লক্ষ্য সাধনের চেষ্টা করেছেন, সেধেছেন।

মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলার সরকারের কোন এক সাক্ষীর সাক্ষ্যে প্রকাশ, এক গুপ্তচক্রের সভায় সত্যেন বলেন, 'আমি হাজতে গিয়েছি, হাজতে যে কি কষ্ট তা আমি জানি। যদি আমার জেল হয় তবে জেলে আমার মতন 'সত্যেন্দ্রনাথ' তৈরি করে নোব। এবং যদি আমার জেল না হয় তবে বিদেশী শাসকরা যে কত বড় তা দেখা যাবে……"

বিপ্লবীর উপযুক্ত কথাই বটে। সত্যেন তাঁর কথা রেখেছেন। তিনি জেলখানায়ও 'সত্যেন' তৈরি করে দেশ-শত্রু নিপাত করেছেন।

সত্যেন, কানাই দেশের জন্য নিজেদের বুকের রক্ত দিতে দ্বিধা করেন নি। তাই তাঁরা আজ দেশের লোকের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন।

দলাদলি বা নেতৃত্বের মোহে যাঁরা একদা মিথ্যাজাল রচনা করে সত্যেনের সুনামে কালিমা-লিপ্ত করতে চেয়েছিলেন আজ তাদের সে মিথ্যাজাল তাসের ঘরের মত উড়ে গেছে—মিথ্যা-জাল রচনা চিরস্থায়ী হতে পারে না, কোনদিন হয়নি।

মতিলাল রায় বলতে চেয়েছেন নরেন গোঁসাই বধের ষড়যন্ত্রের কথা ৪।৫ জন জানতেন—তার মধ্যে কানাই অন্যতম; পারলে তিনি বলতেন, তাঁরই নায়কত্বে গোঁসাই-বধ সম্ভব হয়েছে!

তা সত্য নয়। এর পরিকল্পনা সত্যেন্দ্রনাথ এবং হেমচন্দ্র কানুগোই জানতেন মাত্র। এ সহজ সত্য স্বীকার করলেও কানাইলালের নির্ভীক আত্মদান অতুলনীয়ই থাকত। সত্যেনের সম্মান বৃদ্ধিতে তা মলিন হবার নয়।

নেতৃত্বের মোহে অন্ধ হয়ে যে কালি তখন তাঁরা ছিটিয়েছেন সে কালির ছিটা এখন নেতাদের গায়েই ফিরে এসেছে।

দেশের লোক কিন্তু আজ অজ্ঞ নয়। তাঁরা অনুসন্ধান করে সত্যকার তথ্য বার করতে জানেন—তাঁরা তা করেছেনও। সত্যেন, কানাই স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর, অক্ষয় হয়ে থাকবেন।

যে ঘটনা অবলম্বন করে এই নরেন গোঁসাই-বধ পর্বের উৎপত্তি তা নীচে সংক্ষেপে দেওয়া গেল।

আই, সি, এস, পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের পরও সামান্য কারণে অরবিন্দবাবুকে আই, সি, এসে নেওয়া হয় না। বরোদার মহারাজার আগ্রহাতিশয্যে তিনি তাঁর কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। যুদ্ধ-বিদ্যা শেখার জন্য ভারতের এমন-কোন সামন্ত রাজা ছিলনা যাঁর কাছে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধন্না না দেন। বাঙালী বলে কোথাও তিনি তার সুযোগ না পেয়ে হতাশভাবে বরোদায় অরবিন্দবাবুর শরণাপন্ন হন এবং নামের 'বন্দ্যো' ত্যাগ করে 'উপাধ্যায়' অংশ যোগ করে। সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বরোদার সৈনিক-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী পদে উন্নীত হন।

১৯০২ সালের ১৫ই আগস্ট অরবিন্দ বাবু যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে কলিকাতায় যান। তখন কোন বাঙালীর পক্ষে ইংরাজদের তাড়িয়ে দেবার কথা দূরে থাকুক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে বা আলোচনা করতেও ভয় হত। এমনি সময়ে তাঁরা কলিকাতায় আসেন গুপ্ত-সমিতি স্থাপনের আয়োজন করতে।

প্রায় একই সময়ে কলিকাতায় একটি ও মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করে এবং যথাযথ উপদেশাদি দিয়ে তিনি বরোদায় ফিরে যান। অরবিন্দ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন

ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথের পরিচালনায় কলিকাতার আপার সাকুলার রোডে তাঁদের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। মেদিনীপুরের শাখায় স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং হেমচন্দ্র কানুনগো'র পরিচালনায় বৈপ্লবিক কাজ খুব দ্রুত চলে।

গুপ্ত-সমিতির তখন বিশেষ কাজ ছিল বিপ্লববাদ প্রচার আর তার বহিরঙ্গ ছিল শারীরিক ব্যায়ামের ছলে ছোটলাটি খেলা, ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল চড়া শেখানো। মুর্তাজা অসি শিক্ষা দিতেন।

পিঃ মিত্র মহাশয় এর কিছুকাল আগে থেকেই অনুশীলন সমিতি নামে এক গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করে দস্তুরমত বিপ্লববাদ প্রচার আরম্ভ করেন, অর্থাৎ লাঠিখেলা অসিখেলা প্রভৃতি এবং রাজনীতি চর্চা করতে থাকেন।

১৯০৩, ১৯০৪, সাল এইরূপ খেলা-ধূলা, বৈপ্লবিক নীতিশিক্ষা ও শারীরিক চর্চাদির মধ্য দিয়েই কেটে যায়।

১৯০৪-০৫ সাল। এই সময় অরবিন্দ বাবু বরোদার কাজ ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে বিপ্লবের কাজ চালানোর জন্য কলিকাতায় আসেন। নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে তিনি কাজে অগ্রসর হন।

১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট বঙ্গ ভঙ্গ ঘোষিত হয়। এই সম্পর্কে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয় তার আবরণেই গুপ্ত-সমিতি খুব প্রসার লাভ করতে থাকে।

১৯০৬ সালে 'যুগান্তর' বার হয়। বৎসর দেড়েক চালানোর পর বারীন্দ্রকুমার কাগজ ছেড়ে দলে লোক সংগ্রহে মন দেন। ১৯০৭ সালের গোড়া থেকে ১৯০৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত যেসব ছেলে সংগৃহীত হয় তাদের কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে রাখা হয়। এই সব ছেলেদের ধর্ম, রাজনীতি বিপ্লবের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হত। এই সময় উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি এই দলে যোগ দেন।

মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র কানুনগো মহাশয় নিজের ঘর-বাড়ি বিক্রি করে ফ্রান্সে যান এবং গুপ্ত-সমিতির সংগঠন-প্রণালী, বোমা তৈরী শিখে আসেন। তখন থেকে বাঙলায় বোমার আবির্ভাব হয়।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর যখন সংবাদপত্র সম্পাদকদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার সংখ্যা বেড়ে উঠে তখন বিপ্লবীরা বোমা প্রভৃতির ব্যবহার করার বিষয় চিন্তা করতে থাকেন। গুপ্ত-সমিতির কাজ তখন চলছে অনেকের দান-দক্ষিণার ওপর। তখন যার কাছেই টাকার জন্যে যাওয়া হত তিনিই তাঁদের সরকারী বড় বড় হোমরা-চোমড়া লোকের মাথা নেবার পরামর্শ দিতেন। তারা বলতেন, সমগ্র জাতির প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগ্রত হয়েছে, আপনারা প্রতিশোধ গ্রহণের ভার নিন। বিপ্লবীরাও তখন মনে করেন, ইহাই বুঝি সমগ্র জাতির আদেশবাণী। তাই তাঁরা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে এ

কাজের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। তাঁদের কয়েকজন এই কাজের জন্য আত্মদান করতেও প্রস্তুত হন।

তারপর পরপর বৈপ্লবিক-হত্যার কয়েকটি উদ্যম হয় —এ, ফ্রেজার, চন্দননগরের মেয়র এবং কিংস্ফোর্ডের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। কয়েকটি ডাকাতিরও ব্যর্থ চেষ্টা হয়। কিংস্ফোর্ডকে মারতে যেয়ে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লচাকী ভ্রমক্রমে দুজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে হত্যা করেন। ধরা পড়ে প্রফুল্লচাকী নিজের হাতের অগ্নি-নালিকায় আত্ম-হত্যা করে পুলিশের হাত এড়ান এবং ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয় গান গেয়ে যান।

এর কিছুদিন পূর্ব থেকেই বিপ্লবীদের কাজকর্মে পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তারা বিপ্লবীদের অনুসরণ করতে আরম্ভ করে।

২ রা মে কলিকাতার বিপ্লবীদের ধবার জন্য তারা তাঁদের নানা কেন্দ্রে বেড়াজাল ফেলে।

ফলে মাণিকতলা মুরারীপুকুর গার্ডেনে ধৃত হয়, বারীন্দ্রকুমার বিভূতি সরকার, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, নলিনী গুপ্ত, পরেশ মৌলিক, বিজয় নাগ, শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বক্সী, কুণ্ডুলাল সাহা, পূর্ণ সেন, হেমেন্দ্র ঘোষ—এই ১৪ জন।

১৫ নং গোপী মোহন দত্তের লেনে ধৃত হন, কানাইলাল দত্ত ও নিরাপদ রায়।

১৩৪ নং হ্যারিসন রোডে নগেন গুপ্ত, ও ধরণী গুপ্ত এই ভ্রাতৃদ্বয় আর অশোক নন্দী ধৃত হন।

৮ নং গ্রে ষ্ট্রীটে অরবিন্দ বাবু, অবিনাশ ভট্টাচার্য ও শৈলেন বসু এবং ৩০।৫ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) ধৃত হন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু এর কিছুদিন আগেই অস্ত্র-আইনে মেদিনীপুরে জেল ভোগ করছিলেন। তাঁকেও টেনে এই বোমার মামলায় আনা হয়। বাংলায় এই তরুণ বিপ্লবীদের সংগৃহীত বোমা, পিস্তল প্রভৃতি অনেক-কিছু বে-আইনী দ্রব্য পুলিসের হাতে পড়ে।

ধৃত এই বিপ্লবীদের নিয়েই 'আলীপুর বোমার মামলার' উদ্ভব। এদের নানাজনের স্বীকারোক্তির ফলে নানা স্থান থেকে আরো বহুলোক ধৃত হয়। এই সঙ্গে শ্রীরামপুর থেকে আসে নরেন গোঁসাই।

এই নরেন গোঁসাই দেশদ্রোহী হয়ে রাজসাক্ষী হন এবং সত্যেন ও কানাইলাল তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হন।

সূচীপত্র

ফাঁসীর সত্যেন

[এক]

বাল্যজীবন

"বাঁধন ছিঁড়তে হবে এই মোর মতি
লক্ষ কোটি প্রাণী সহ মোর এক গতি
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
একা আমি বসে রব মুক্তি সমাধীতে।"

—রবীন্দ্রনাথ

নগণ্য বুয়র এবং বিপুল শক্তিশালী ব্রিটিশ-শক্তির মধ্যে বছর দুই ধরে যুদ্ধের যে বিরাট ব্যাপার চলে তার প্রভাব পরাধীন জগতের রাজনৈতিক মনোভাবে একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনয়ন করে। বাঙলা দেশে তার প্রভাব নামেমাত্র হলেও কার্যকরী হয়। রাজা রামমোহন ও পরবর্তী মনীষীদের ধর্মের আন্দোলন, বিশেষ করে, ঋষিকল্প রাজনারায়ণের

স্বাদেশিকতার প্রচারণা একটা যথোপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তুলেছিল বলেই তা সম্ভব হয়।

১৯০২ সালে বুয়র যুদ্ধ শেষে তাই বাঙলা দেশে গুপ্ত-সমিতির পত্তন সম্ভব হয়। কিন্তু তা দু'য়েক বছরের মধ্যেই তৈলহীন প্রদীপের মত নিস্তেজ হয়ে আসে। সেই সময়ে আবার রুশ-জাপান যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় জগতে যেমন সংগ্রামের প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় বাঙলাতেও তা বেশ একটু অনুভূত হয়। সেই উত্তেজনা-যজ্ঞে ইন্ধন জোগায় বঙ্গ-ভঙ্গ-জনিত আন্দোলন—তা-ই স্বদেশী আন্দোলন নামে সুবিখ্যাত।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন না হলে যেমন হয়ত বিপ্লব-প্রবৃত্তি ক্রমে লোপ পেয়ে যেত, আবার পূর্ব থেকে জনসাধারণের মন বিপ্লবের ভাবে উদ্বুদ্ধ না হয়ে থাকলে এই স্বদেশী আন্দোলনও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত।

১৯০২ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত বাঙলায় যে বিপ্লবের আয়োজন ও অনুষ্ঠান চলে তার একজন প্রধান কর্মী ও নেতা ৺সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

সত্যেন্দ্রনাথ ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺অভয়চরণ বসুর পুত্র। অভয় বাবু মেদিনীপুর

কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তাঁর পাঁচ মেয়ে ও পাঁচ ছেলে। সত্যেন বাবুর ভাই-ভগিনীগণের নাম যথাক্রমে :— ৺কুসুমকুমারী দেবী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, ৺কুমুদকুমারী রাহা, ক্ষিরোদ কুমারী ঘোষ, সুরবালা বসু, শৈলবালা বসু, ৺সত্যেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, সুবোধকুমার ও সরলকুমার।

সত্যেন্দ্রনাথের মাতার নাম ৺তারাসুন্দরী বসু। আজ ২০।২২ বছর হল তিনি পরলোক গমন করেন।

১২৮৯ সালের ১৫ই শ্রাবণ (১৮৮২ সালের ৩০শে জুলাই) রবিবার ৯টা, ৪৫ মিনিটে রাখী-পূর্ণিমা তিথিতে মেদিনীপুরের বাটিতে সত্যেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হন।

তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁকে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর স্মরণ-শক্তি খুব প্রখর ছিল।

বাল্যকালে লেখাপড়াতে সত্যেন্দ্রনাথ বেশ সুনাম অর্জন করেন। ফি বছরই প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তিনি ভূরি ভূরি পুরস্কার লাভ করেন।

লেখা-পড়ার চাইতে তাঁর চরিত্রে যা ছিল অতুলনীয় তা হল তাঁর অমায়িক ব্যবহার, চরিত্রবল, মনের বল, সত্যবাদিতা। শৈশবকাল থেকে সকলের সঙ্গে এমনভাবে মিশতে পারতেন আর অকপট সরল ব্যবহারে এমনভাবে তাদের আপনার জন করে

নিতে পারতেন বলেই উত্তরকালে মরণ-রঙে দোসর করবার অনেক অকৃত্রিম বন্ধু তিনি পেয়েছিলেন। তাঁরই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা নিজেদের প্রাণ-মন মাতৃমন্ত্রে উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন।

পনের বছর বয়ঃক্রমকালে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় (Entrance Examinationএ) প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে মেদিনীপুর কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৯ সালে এই কলেজ থেকেই তিনি এফ-এ পরীক্ষায় পাশ করেন। তার কিছুকাল আগে ১৮৯৮ সালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তারপর তিনি কলিকাতা সিটি কলেজে (City College) বি, এ, ক্লাসে ভর্তি হন।

তখন তাঁর ভগ্নিপতি রাধানাথ দেব মহাশয় কলিকাতা শিয়ালদহ ছোট আদালতে (Sealdah Small Cause Court-এ) ওকালতি করতেন। তাঁর বাসাতেই থেকে তিনি কলেজে পড়েন। বি, এ, পরীক্ষা দেবার পূর্বে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন এবং ডাঃ নীলরতন সরকার প্রাণধন বাবু প্রভৃতি কলিকাতার তখনকার অনেক বড় বড় ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকেন। সকলেই তাঁর পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের (রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের) প্রতি শ্রদ্ধার খাতিরে বিনা-পারিশ্রমিকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে চিকিৎসা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেক

কাল চিকিৎসার পর ডাক্তারেরা ধরতে পারেন যে সত্যেনের রাজযক্ষ্মার সম্ভাবনা ।

ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁর মাতৃদেবী তাঁকে নিয়ে কিছুদিন ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থান করেন। তাঁর নষ্টস্বাস্থ্য কতকাংশে পুনরুদ্ধার হয় বটে, কিন্তু আরো কিছুকাল স্বাস্থ্যকর স্থানে নিশ্চিন্তভাবে থাকা তাঁর পক্ষে মঙ্গলদায়ক হত সন্দেহ নেই কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। বৈপ্লবিক কাজ টিকি ধরে তাঁকে তখন টানতে লাগল।

[দুই]

কর্মজীবন

নূতন দিনের নব-যাত্রীরা চলিবে বলিয়া এই পথে
বিছাইয়া যাই আমাদের প্রাণ সুখ দুখ সব আজি হতে
ভবিষ্যতের স্বাধীন পতাকা উড়িবে যেদিন জয়-রথে
আমরা হাসিব দূর তারা লোকে, ওগো তোমাদের সুখ স্মরি।

—নজরুল

ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু ও তৎপরবর্তী কোন কোন্ স্বদেশ-প্রাণদের উদ্যোগে ১৯০২ সালের পূর্বেও নাকি কয়েকবার গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় কিংবা তা কেবল কুস্তি, কসরৎ ও লাঠি-খেলার আখড়ায় পরিণত হয়েই চলতে থাকে। তা ছাড়া, সে সময় স্বাদেশিকতার ভাব বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্ম পরিবার—বিশেষ করে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে অত্যধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত বিদেশজাত দ্রব্যাদি বর্জন ও তার পরিবর্তে স্বদেশী দ্রব্য-সামগ্রী গ্রহণ প্রবৃত্তি তাঁদের

মধ্যে সেকালেও বিদ্যমান ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের ভাই-ভগিনী-দের মধ্যে এই স্বাদেশিকতার প্রভাব তখনকার পক্ষে যথেষ্টই ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রবৃত্তি পিতৃব্য থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে এবং তাঁর আশৈশব সঙ্গগুণে বিশেষভাবেই পেয়েছিলেন।

ওয়ালটেয়ার থেকে সত্যেন্দ্রনাথ ১৯০২ সালে মেদিনীপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন মেদিনীপুরে সবেমাত্র একটি গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কলিকাতায়ও কেন্দ্র-সমিতি খোলা হয় এ সময়। সত্যেন্দ্রনাথের এখানে ফিরে আসার অত্যল্পকাল পরেই তাঁর ভাগ্নে অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় মেদিনীপুরে আগমন করেন। মেদিনীপুরে যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে তখনও দীক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। উক্ত নেতা ১৯০২ সালের শেষ-ভাগে এই সমিতির কয়েকজনকে দীক্ষা প্রদান করেন। সত্যেন তাঁদের অন্যতম।

দীক্ষা গ্রহণ করবার পরে মেদিনীপুর মিঞা-বাজারের একটি বাড়ি নিয়ে কুস্তির একটা আখড়া খোলা হয়। সেখানে তাঁদের লাঠিখেলা, অসি শিক্ষা, সাইকেল অভ্যাস, অশ্বারোহণ, বক্সিং শিক্ষা, বন্দুক ছোঁড়া শিক্ষা প্রভৃতি চলে। এখানে বক্সিং শেখার জন্য কলিকাতার—বসুকে নিযুক্ত করা হয়। অশ্বারোহণ শেখার জন্য একটি ক্ষুদ্রকায় অশ্বও নাকি তখন কেনা হয়েছিল।

মেদিনীপুরের পশ্চিম প্রান্তে, শহরের অনতিদূরে একটা চারদিক-ঘেরা নীচু জায়গা ছিল। রাস্তার জন্য কাঁকড় তুলে নেওয়ায় ঐ স্থানটি গোপনে চাঁদমারি শেখার পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক হয়ে উঠে।

এই আখড়া উদ্বোধনের প্রথম দিন ভারত-হিতৈষিণী স্বনাম-ধন্যা ভগিনী নিবেদিতা উপস্থিত থেকে দ্বারোদ্‌ঘাটন ক'রে আখড়ার যুবক সভ্যদের বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন। তা'ছাড়া এতৎ সম্পর্কিত নানাবিধ পুস্তকাদি দিয়াও নাকি তিনি সাহায্য করেন। সত্যেনই ছিলেন এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা।

এই সময়ের কিছুকাল পরেই কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত আপার সার্কুলার রোডের বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতিতে সত্যেন্দ্রনাথ যোগদান করেন।

আপার সার্কুলার রোডে বাঙলার বিপ্লবী-পন্থীদের তখনকার বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্ট পি, মিত্রের বাড়ি ছিল। বহুকাল পূর্ব থেকেই তাঁর একটি সমিতি ছিল। তার নাম ছিল অনুশীলন- সমিতি। তাতে কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতির অনুশীলন চর্চা হত।

বারীন্দ্রকুমারের দল তাঁর দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকেই বাঙলার বৈপ্লবিক দলের সভাপতিরূপে বরণ করে নেন।

১০৮, আপার সার্কুলার রোডের বাটীতেই নতুন দলের আখড়া ও আড্ডা খোলা হয়। এখানকার নেতা বা প্রধান কর্মী ছিলেন বাবু যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বারীনবাবু ছিলেন তখন তাঁর অধীনস্থ কর্মী; দুই একজন সাধারণ কর্মীও এখানে থাকতেন। যতীন-বাবুর সঙ্গে তাঁর এক স্ত্রী ও তাঁর এক বিধবা ভগিনী অবস্থান করতেন। কলিকাতার এই আড্ডাতে সত্যেন বাবুও কিছুদিন যেয়ে থাকেন।

বৈপ্লবিক নিয়ম-কানুন পদ্ধতি শিক্ষাকল্পে সেখানে ছিল একটি ছোটখাট লাইব্রেরী, একটি সাইকেল, একটি বড় ওয়েলার ঘোড়া। খরচপত্র চালাবার জন্য বিশেষ বিশেষ সম-দরদীদের কাছ থেকে কিছু-কিছু চাঁদা আদায় করা হত।

যতীন-বাবু ছিলেন মিলিটারীম্যান। তাঁর মেজাজও ছিল নাকি সেই রকম। অধীনস্থ সকলকে দাবিয়ে রাখার প্রকৃতিটা ছিল তাঁর অত্যধিক পরিমাণে। বারীন বাবুর বয়স তখন ছিল অন্যূন বাইশ-তেইশ বছর। তিনি তখনই সেরা নেতা হবার জন্য ভয়ানক অভিলাষী। এই আকাঙ্ক্ষার সফলতার অন্যতম পরিপন্থী ছিলেন এই যতীন বাবু। তারপর বোঝার উপর শাঁকের আঁটির মত সত্যেন বাবুও সেখানে যেয়ে উপস্থিত হন। বোধ হয় বারীন বাবু সত্যেন বাবুর মধ্যেও 'নেতার' বিশিষ্ট বিশিষ্ট লক্ষণ দেখেন। তাই তিনি

উপরোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীযুগলকে 'এক ঢিলে দুই শীকার' করবার মতলবে যতীন্দ্র বাবুর বিধবা ভগিনীকে ঢেলারূপে ব্যবহার করেন। ঐ বাল-বিধবার সঙ্গে প্রথমে সত্যেনের ও পরে তাঁর দাদার কু-অভিসন্ধিমূলক সম্বন্ধ আছে বলে অরবিন্দ বাবুর নিকট অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। নেতারা যতীন বাবুকে দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মনে করতেন; তবু বারীন বাবুর চেষ্টায় বিনা-বিচারে বা সত্য-মিথ্যা অনুসন্ধান না করেই অরবিন্দ বাবু উভয়কেই পর পর তাড়িয়ে দেবার আদেশ দেন। সত্যেন বাবু বিরক্ত হয়ে মেদিনীপুরে ফিরে যান।

এইসব অন্তর্বিরোধের ফলে সার্কুলার রোডের 'আস্তানা' উঠে যায়। পরে আড্ডা খোলা হয় গ্রে স্ট্রীটে। ১৩২৯ সালের বিজলীতে "বোমার যুগের কাহিনী' নামক বারীন বাবুর যে প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয় তাতে তিনি স্বীকার করেছেন যে, সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া তাঁর ঈর্ষা-দুষ্ট ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

যাহোক সত্যেনবাবু মেদিনীপুরে ফিরে আসার পর নতুন উদ্যমে সেখানকার গুপ্ত-সমিতির কাজে লেগে যান। এই সময় তাঁর সাংসারিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠে। তাই তিনি খড়গপুরে কেল্‌নার কোম্পানীর হোটেলে কেরাণীগিরির একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। মেদিনীপুরের আখড়া তখন প্রায়

উঠে যায় বটে কিন্তু বিপ্লববাদের প্রচার-কার্য সত্যেন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষভাবে চলতে থাকে স্কুল-কলেজের ছেলেদের মধ্যে। প্রচার-কার্যে সত্যেনের জুড়ীদার তখন আর কেউ ছিলেন না। নয়৷দশজন ছেলে তাঁর বিশেষ সহকর্মী হয়ে ওঠে। তাঁর অমায়িক ব্যবহার এবং চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ বিশেষভাবে তাঁর সঙ্গে মেশামেশি করতে আসত। তাদের চরিত্র-গঠনে তিনি সাধ্যমত সাহায্য করতেন। পরে তাদের মধ্যে যাকে উপযুক্ত বলে সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতেন অবসর মত তাদের কাছে গুপ্ত-সমিতির আভাস দিতেন (sound করতেন)। তাদের মধ্যে আবার যারা গুপ্ত-সমিতির সভ্য হবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করত তাদের তিনি যথারীতি দীক্ষা প্রদান করতেন।

এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ নানাপ্রকার রাজ-নৈতিক পুস্তক, ইতিহাস, সাময়িক সংবাদ-পত্রাদি নিজে পড়তেন, অন্যকে পড়াতেন এবং এইসব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনাদি করতেন। বই পড়া তাঁর পক্ষে নেশার মত ছিল।

তখনকার কয়েকখানি বিশেষ বিশেষ পত্রিকার সংবাদ-দাতাও ছিলেন তিনি।

[তিন]

স্বদেশী আন্দোলনে সত্যেন্দ্রনাথ

"তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান !
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার।"

—নজরুল

বঙ্গ-বিভাগের আয়োজন রদ করবার জন্য যখন বাঙলা-দেশে আন্দোলনের উদ্ভব হয় সত্যেন্দ্রনাথ কেল্‌নার কোম্পানীর চাকরী পরিত্যাগ করে মেদিনীপুরের কালেকটরীতে কেরাণীগিরি চাকুরী জুটিয়ে নেন। এই আন্দোলনের প্রভাবে বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির সভ্যদের উৎসাহ ও কর্ম-প্রবণতা যেমন প্রসার লাভ করে তেমনি দেশের মনোভাবে বিগত কয়েক বছর যাবত বিপ্লবের বীজ যৎসামান্যও ছড়ান ছিল বলেই ঐ আন্দোলনও পূর্ব সকল আন্দোলন অপেক্ষা ভীষণতর হয়ে উঠে। সত্যেন্দ্রনাথ সেই সময় মেদিনীপুরে আবার একটি ঘর ভাড়া করে আড্ডা খুলেন। তার নাম দেন তাঁতশালা। একটা তাঁতে সব সময়ই একখানা কাপড় অর্ধ-প্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যেতো।

আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত নিরাপদ রায় ওরফে নির্মল রায় নদীয়া থেকে, শান্তিপুর থেকে বিভূতি ভূষণ সরকার এসে সেখানে জুটেন। মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম, শচীনও এই তাঁতশালা গুলজার করে তোলেন। দলের লোক ভিন্ন বাইরের কেউ তাঁতশালা দেখতে আসলে ঐ তাঁতখানা চালিয়ে দেখানো হত যে তাঁরা সবাই উদার-তাঁতি—তাঁত বুনে, খায় দায় আর ঘুমোয়। আসলে কিন্তু তাঁরা ভাবতেন কোথায় বিলিতি কাপড়ের দোকান অগ্নি-সংযোগে লালে-লাল করে দিতে হবে, কোথায় সাল-ফিউরিক বা নাইট্রিক এসিড চালাতে হবে, কোথায় ফসফরাস্ গুঁজে রেখে আসতে হবে, স্বদেশী-দ্রব্য-প্রচারের বিরোধী কাউকে লাঠ্যোষধি বিধান করতে হবে, কার লবণের গাড়ি উল্টে দিতে হবে, শহরের বাইরে কোন্ হাটে পিকেটিং করতে হবে, কোথায় বিলিতি মাল-বোঝাই নৌকা ডুবাতে হবে, মফঃস্বলে পিকেটিং করতে যেয়ে যেসব 'পুলিশ কেস' হত তার মোকদ্দমা চালাবার কি ব্যবস্থাদি হবে, এসকল কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ কিরূপে হবে। এই ধরণের নানাপ্রকার কাজের আলোচনা ঐ তাঁতশালাতেই হত, আর সত্যেন্দ্রনাথই ছিলেন তার একাধারে মন্ত্রণাদাতা, উদ্যোক্তা, সকল কাজের অগ্রণী নেতা।

এই সকল কাজ সম্পন্ন করার সময় অনেক বার পুলিস তদন্ত ও মোকদ্দমা হয়। পুলিস তদন্তের সময় অন্য ছেলে-ছোক্‌রারা পুলিসের প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে পাছে বিপদ ঘটায় তাই সত্যেন্দ্রনাথ নিজে প্রায় সব সময়েই আগে যেয়ে পুলিসের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় দলের একজন এক বিলিতি বস্ত্রের দোকান-ঘরের চালে খানিকটা 'ফসফরাস্' কিরকম কৌশলে গুঁজে রেখে আসেন। ঘণ্টা দুই পরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে' সমস্ত দোকানটি ছাই হয়ে যায়। পুলিশ-তদন্ত আরম্ভ হল। সত্যেন্দ্রনাথই পুলিসদের বুঝিয়ে দেন যে দোকানটিতে কেবলমাত্র দোকানদারেরই অসাবধানতায় আগুন লেগে যায়।

কোন লোক অনেক সাধ্য-সাধনায়ও যখন বিলাতি কাপড় ক্রয় করা থেকে নিবৃত্ত হত না, তখন বিলাতি কাপড় কিনে কোন্ পথে তিনি যান তা লক্ষ্য করবার জন্য তিনি লোক নিযুক্ত করতেন এবং নির্জন-পথে তারা তাঁকে ধরে বিলিতি দ্রব্য ফিরিয়ে দিয়ে আসতে আবার সাধ্য-সাধনা, ক্রমে ধমক এবং পরে তার লাঞ্ছনার একশেষ করে ছাড়ত।

যদিও ব্রাহ্ম-স্বভাবসুলভ সততা, পরদুঃখকাতরতা ও পর-পীড়নজনিত কাতরাদি গুণ বাল্যকাল থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের স্বভাবে খুব বেশি পরিমাণে ছিল, তবুও দীক্ষার পর ক্রমে বিপ্লবী-

স্থূলভ নৃশংসতাদি তাঁর স্বভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। তাঁর অজুহাত ছিল, বৃহত্তের মঙ্গলের জন্য ছোটখাট অন্যায়-অত্যাচার অলঙ্ঘনীয়। যাই হউক, পিকেটিংয়ের অন্যায়-অত্যাচার স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে (এমন-কি এখনও) হিতৈষণার বিশেষ লক্ষণ বলে গণ্য হয়।

[চার]

মেদিনীপুরে কনফারেন্স

"প্রকৃত সন্তান জেন সেই জন,
নিজ দেহ-প্রাণ দিয়ে বিসর্জন,
যে করিবে মা'র দুঃখ বিমোচন
হবে তার মাতৃ-ঋণ প্রতিদান।"

—কাব্যবিশারদ

১৯০৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন মেদিনীপুরে হয়। তার সমস্ত আয়োজনের প্রধান কর্ম-কর্তা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। ঐ অধিবেশনের পূর্বে মধ্যে মধ্যে সভা ডাকা, চাঁদা সংগ্রহ করা, ভলান্টিয়ারদল সংগঠন, মণ্ডপ প্রস্তুত, ডেলিগেটগণের অভ্যর্থনার আয়োজন ইত্যাদি সকল কাজ করবার ও সম্পাদন করিয়ে নেবার ভার ছিল কর্মী সত্যেন্দ্র-নাথের উপর। তাঁর কর্মকুশলতা দেখে বিপক্ষদলের বিশেষ বিশেষ নেতারা—এমন-কি বাগ্মীপ্রবর সুরেন্দ্রনাথও তাঁর অজস্র প্রশংসা না করে থাকতে পারেন নি। সেই সময় দেশের নেতারা 'নরম পন্থী' ও 'চরম পন্থী' এই দু'দলে বিভক্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। প্রত্যেক দলই চেষ্টা করছিল যে কংগ্রেস,

কন্‌ফারেন্স তাঁদের কর্তৃত্বাধীনে থাকবেন। এযাবত প্রকাশ্য-ভাবে সভাস্থলে ঝগড়া-ঝাটী অর্থাৎ মারামারি-গালাগালি হয়নি।

নরমপন্থীরা দলে খুব ভারী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্র বাবু, অম্বিকাচরণ প্রভৃতি এই দলে ছিলেন। গরম দলের নিয়ামক ছিলেন, অরবিন্দ, অশ্বিনীকুমার, বিপিন পাল, শ্যামসুন্দর প্রমুখ সুবিখ্যাত নেতৃবৃন্দ। নরম দলের প্রবীণ নেতারা সুরেন্দ্রনাথকে সভাপতি করিয়া কার্যোদ্ধারের চেষ্টায় ছিলেন। আর গরম দলের নবীন নেতারা অরবিন্দবাবুকে সভাপতি ক'রতে উ'ঠে প'ড়ে লাগলেন।

এই নিয়ে ভীষণ বাকযুদ্ধ আর অকথ্য ভাষায় গালাগালি আরম্ভ হ'তে দেখে পুলিসের আমদানী হয়েছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়েস্টন সাহেব নাকি এই মর্মে এক রুল জারি করেন যে যদি এই ব্যাপারে কোন অনর্থ ঘটে তবে সত্যেন্দ্রনাথকে তার জন্য দায়ী হ'তে হ'বে। এই করারে একটি সর্তনামা সত্যেন্দ্রনাথকে দিয়ে দস্তখত করিয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। চতুর সত্যেন্দ্রনাথ কৌশলে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

উভয় দলের মধ্যে অনেক বাক্যবাণ প্রয়োগেও যখন কোন আপোষ-মীমাংসা হ'ল না তখন গরম দল সভামণ্ডপ ছেড়ে যাওয়ায় ঐ শহরের বাসন্তীতলা নামক স্থানে একই সময়ে সত্যেন্দ্রের ক্ষিপ্রকারিতায় পৃথক সভার অধিবেশন হয়।

এর পরবর্ত্তী সুরাট কংগ্রেসে এই তাণ্ডব-লীলার জের আরও বিকটরূপ ধারণ ক'রে সুরাট কংগ্রেসকে দক্ষ-যজ্ঞের মত পণ্ড করে। এখানে বারীন বাবুর আত্ম-কাহিনার 'ভূতের কীর্ত্তন' পরিচ্ছেদ থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল তা' থেকেই জানতে পারা যাবে সত্যেন্দ্রের ঐ তাণ্ডব-লীলাতে কতটা হাত ছিল। আর এও জানা যাবে শৈশবের নিরীহ সত্যেন্দ্রনাথ, বাল্যের শান্তশিষ্ট সত্যেন্দ্রনাথ, যৌবনে কি রকম দুর্দ্ধর্ষ ও নির্ভীক স্বভাবসম্পন্ন হয়ে উঠে ছিলেন।

"প্রথম দিন গণ্ডগোল আরম্ভ হইল সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া। মেদিনীপুরে বাঙলার প্রাদেশিক কনফারেন্সে সুরেন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করিয়াই ঝড় উঠিয়াছিল, এখানেও হইল তাহাই। সুরেন্দ্রনাথ সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠিবামাত্র "শেম, শেম, দেশদ্রোহি" ইত্যাকার রব উঠিল, তাঁহার বক্তৃতা কেহ শুনিবে না, তাঁহাকে অপদস্ত করিয়া বসাইয়া দিতে হইবে, এই হইল গোঁ। বঙ্গের এতদিনের রাজনীতিক দুলাল, অসপত্ন-নেতা সুরেন্দ্রনাথ কখন লোকমতের কাছে মাথা নীচু করিতে শিখেন নাই, তামস অন্ধ দেশের তিনি ছিলেন রাখাল রাজ, এতদিন লাঠি হাতেই গরু চরাইয়াছেন।...আজ দেশ গোজন্ম ঘুচাইয়া মানুষ হইতেছে, আজ সুরেন্দ্রের উপর গরমদলের অন্ধরাগ। কংগ্রেস মণ্ডপ ভরিয়া মুহুর্মুহু শৃগাল-

ধ্বনির জ্বালায় সুরেন্দ্রনাথ তো বক্তৃতা দিতে পাইলেনই না, উপরন্তু কংগ্রেস ভাঙিয়া গেল।...

...সুরেন্দ্রনাথ সমস্ত বাঙালার প্রতিনিধিদিগকে তাঁহার তাঁবুতে ডাকিয়া পাঠালেন, উদ্দেশ্য এই যে, সেইখানে বুঝাইয়া পড়াইয়া বাঙালাকে একমত করিতে পারিলে অন্যান্য প্রদেশ বাঙালার রায় মানিয়া লইবে।......সেখানে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন, ভূপেন্দ্রনাথ, আশু চৌধুরী, অম্বিকাপ্রসাদ মজুমদার ছিলেন, আরো যে কতজন ছিলেন—"অযুত ভকত গোরার নাম নিব কত?" এদিকে গরম দলেরও ছিলেন অরবিন্দ, মতিলাল, অশ্বিনী দত্ত, শ্যামসুন্দর আদি রথীর দল। এই দুই দলের মধ্যে নরম দল ধাপ্পা দিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া কোন গতিকে নিজের মত, বিনা পণে বজায় রাখিতে উৎসুক ও গরম দল উদাসীন। নরম দল তখনও বুঝেন নাই যে, ইহাদিগকে উদরস্থ করিয়া মিলন—তাহা আর হইবার নয়।

"অনেক বাকবিতণ্ডা করিয়া ও যুক্তি-তর্ক অনুনয়-বিনয়ের পালা গাহিয়াও কিন্তু আসর আর জমিল না। সুরেন্দ্রনাথের আদেশে অম্বিকা বাবু একটা কাগজে কি মিলনসূচক অঙ্গীকার লিখিয়া সকলকে দস্তখৎ করাইতে সকলের কাছে ঘুরিতে লাগিলেন। তাহা পড়িয়া এ বলে "ওকে দেখান", ও বলে, "উনি যদি সই করেন, দেখুন গে" ইত্যাদি। সেইখানে

মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আমার মত কয়েকজন গুপ্তচক্রী যুবকের সহিত মজা দেখিয়া পায়চারী করিতেছিল। এ সেই সত্যেন্দ্র, যে পরে আলিপুর মোকদ্দমায় কানাইলালের সহিত রাজ-সাক্ষী নরেন গোঁসাইকে গুলি করিয়া ফাঁসী যায়। অম্বিকা বাবু কাছে আসিতেই সে বলিল, "দেখি মশাই, আমায় দিন, আমি সই করছি।" যাঁহাতক তাহার হাতে দেওয়া, তাঁহাতক ছিঁড়িয়া তাল পাকাইয়া কাগজখানি হাতে হাতে উধাও। অম্বিকা বাবু সুরেন্দ্রনাথের কাছে গিয়া পাকা দাড়ী নাড়িয়া উগ্রচণ্ডারূপে নালিশ জুড়িয়া দিলেন। ফলে মিলন-উৎসব ভাঙ্গিয়া গেল।

"আমি তখন নীরব শান্ত অরবিন্দের পিছনে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছি।……সত্যেন্দ্র ও আমি আরও সাত আটজন বাঙালী যুবককে লইয়া অরবিন্দকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছি। যখন তিনি ধীরপদে মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, তখন বেদীর নিকট হইতে যাইবার সময় উপর হইতে পার্সী যুবক একজন তাঁহার উদ্দেশ্যে থুতু ফেলিল। তবে তখনকার মত দলাদলি আছে কিনা সন্দেহ……প্রথম দিন পথে পথে সত্যেন্দ্র একদল ছেলে লইয়া রাজভক্তিসূচক উক্তিওয়ালা (motto) মঞ্চেতে সন্তর্পণে আগুণ ধরাইয়া ফিরিতেছিল।"

[তিন]

বিপ্লবের কাজে

তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ।

—রবীন্দ্রনাথ

মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের আসর বেশ সরগরম হয়ে উঠে। চারদিক থেকে ছেলেরা এসে নিব-নিব প্রদীপ আবার উস্কে দিয়ে জেঁকে বসল।

রহিম নামে একজন লাঠিয়ালকে লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা কিরিচ খেলা, প্রভৃতি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বেতন করে রাখা হয়। এই লোকটিই নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন আখড়ায় খেলা শিক্ষা দিত।

তখন ছাত্রভাণ্ডার এবং বড় বাজার ও মিঞা-বাজারের আখড়া স্থাপিত হয়েছে। সন্তোষ, যোগজীবন প্রভৃতি কয়েক-জন এই সব আখড়াগুলি বেশ সরগরম করে তুলেছিল। ছেলেদের উৎসাহ বৃদ্ধি করবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে

তাঁর দাদার বন্দুকটি সেখানে নিয়ে যেতেন। বন্দুকটি দেখে ছেলেরা খুবই উৎসাহিত হত। যোগজীবন ও সন্তোষদের বাড়িতেও অসিখেলা শিক্ষা দেওয়া হত। তারা উভয়েই এ বিষ্যায় বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেন।

এর কিছুকাল পূর্ব থেকেই বঙ্গভঙ্গজনিত অশান্তির ঢেউ এসে তাঁদের অনুকূলে বিপ্লব-কর্মের সহায়তা করে।

১৯০৫ সালের শেষভাগে বৈপ্লবিক নেতাদের ও বিশেষ বিশেষ বিপ্লবী কর্মীদের নিয়ে একটি 'বিশেষ কনফারেন্সের' অধিবেশন হয় কলিকাতায়। তাতে স্থির হয়ঃ

(১) একটি বিপ্লববাদের মুখপত্রস্বরূপ কাগজ প্রকাশ করতে হবে।

(২) বৈপ্লবিক ভীষণ কার্য (Terroristic Work) আরম্ভ করা হবে।

(৩) কেন্দ্রে কেন্দ্রে 'ভবানী মন্দির' স্থাপন করতে হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ তদনুযায়ী 'একসন' (action) শুরু করেন একজন স্থানীয় শিক্ষককে লাঠ্যোষধি দিয়ে। সে সময় সেই শিক্ষকটি ছিলেন একটু বেশি খয়ের-খাঁ, আর সেকালে দেশের তরফে সবরকম আন্দোলনে সরকারের পক্ষ নিয়ে নানাভাবে তিনি বাধা দিতেন; তাই তাঁর কাণ দুটি কেটে দেবার ব্যবস্থা হয়। কোন লোকের নাম করে রাত্রি তিনটার সময় জনৈক ব্যারিস্টার

সাহেবের বাড়িতে তাঁকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। যাবার পথে কোমরে ডাণ্ডাঘাতে তাঁকে ধরাশায়ী করে কাণ হাতড়াতে হাতড়াতে ডাকের রাণার (runner) এসে পড়ে। তাই সেযাত্রা মাস্টার মহাশয়ের কাণটি রক্ষা পায়।

"ঐ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুরে 'কৃষিশিল্পপ্রদর্শনী' খোলা হয়েছিল। এই সময় ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ও গালাগালিপূর্ণ 'সোনার বাংলা' নামক একটা বে-নামী বাংলা 'পাম্পলেট' নাকি প্রচারিত হ'য়েছিল। তা'র ইংরেজী অনুবাদ 'পাইওনিয়ার' পত্রে প্রকাশিত হলে ইংরেজমহলে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। সত্যেন তা'র আবার বাংলা অনুবাদ ক'রে হাজারখানেক ছাপিয়েছিল। উক্ত প্রদর্শনীর প্রবেশ-দ্বারের কাছে ক্ষুদিরাম নির্বিচারে সকলকে ঐ পাম্পলেটগুলি বিলি করছিল; এমন সময় একজন হেড কনেষ্টবল এসে তা'কে গ্রেপ্তার করাতে সে নাকি বক্‌সিং-এর খুব কেরামতি দেখিয়েছিল। ইত্যবসরে সত্যেন সেখানে এসে প'ড়ে ব'লে উঠল, "উও ডিপ্‌টিকা লেড়কা হ্যায়, উস্‌কো কেঁও পাক্‌ড়ায়।" সত্যেন ছিল প্রদর্শনীর সহকারী সম্পাদক এবং তখন কালেকটরীতে একজন ডেপুটী বাবুর এজলাসে কেরাণীর কাজ করত। জমাদার সত্যেনকে চিনত, সে ডেপুটীর নাম শুনে, নাকে রক্তপাত সত্ত্বেও ক্ষুদিরামকে ছেড়ে দিয়েছিল। পরক্ষণে

যখন তা'র ভুল ভাঙল তখন ক্ষুদিরামকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

"পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে সত্যেনকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল। তাতে বোধ হয় তা'কে দোষী সাব্যস্ত করবার মত কিছু খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে সে নাকি বে-পরোয়াভাবে হেসে হেসে জবাব দিয়েছিল; তাই সঙ্গে সঙ্গে কেরাণীগিরি হ'তে তা'কে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে কিন্তু রাজদ্রোহের মামলা রুজু করা হ'ল। বাংলাদেশে বিপ্লববাদীদের বিরুদ্ধে, বোধ হয়, এই প্রথম রাজদ্রোহের অভিযোগ।"—[বাঃ বিঃ প্রঃ—পৃঃ ৯০৯-১০]

এই সময় বাঙলার অনেক স্থানে 'ছাত্র-ভাণ্ডার' নামে স্বদেশ-জাত দ্রব্যের দোকান খোলা হয়েছিল। তখন কলিকাতায় এই প্রকার অনেক দোকানের মধ্যে এন্টি-সার্কুলার সোসাইটির তত্ত্বাবধানে কলেজ স্কোয়ারে একটি, আর নিখিলেশ্বর রায়ের তত্ত্বাবধানে হ্যারিসন রোডে 'ছাত্রভাণ্ডার' নামক একটি দোকানের সহিত বিপ্লববাদীদের সম্পর্ক ছিল। মেদিনীপুরেও সত্যেন্দ্রনাথের চেষ্টায় একটি বড় রকমের 'ছাত্র ভাণ্ডার' খোলা হয়। এই দোকানটী জেঁকে উঠাতে তাঁতশালার অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়।

১৯০৬ সালের শেষে সত্যেন্দ্রনাথ কিছুদিন কলিকাতার

চাঁপাতলায় যুগান্তর অফিসে যেয়ে থাকেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি মেদিনীপুরের নানাস্থানে লাঠিখেলার 'আখড়া স্থাপন করতে আরম্ভ করেন। সেই সময় তাঁর অনেক নতুন নতুন 'চেলা' জোটে। তন্মধ্যে প্রকাশচন্দ্র মাইতি, একজন উকীল, সন্তোষ দাস, যোগজীবন প্রভৃতি প্রধান ছিল। ক্ষুদিরাম, নির্মল, বিভূতি সরকার, দীনেশ, প্রভৃতি আগেকার শিষ্যরা 'ছাত্র-ভাণ্ডার' চালাতেন আর মধ্যে মধ্যে মেদিনীপুর জেলার পল্লীঅঞ্চলে আখড়া কিম্বা স্বদেশী সমিতি স্থাপনে সাহায্য করতেন। নির্মল রায় মাঝে মাঝে গ্রামাঞ্চলে দীপালোচনার দ্বারা দেশের দুঃখ-দুর্দশার বিষয় ও তার কারণ সম্বন্ধে কথকতা করতেন। সেই সঙ্গে তিনি সখারাম বাবুর 'দেশের কথা' ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের গ্রন্থাবলীও বিক্রয়াদি করতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁরা 'বন্দে মাতরম ফণ্ডের' জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে-ফিরে চাঁদা আদায়ও ক'রতেন। সেই চাঁদার টাকা একমাত্র গুপ্ত-সমিতির কার্যে লাগানো হ'ত—বিশেষ ক'রে শীকারের ও চাঁদমারীর উপযোগী গোলা-বারুদাদি সংগ্রহের জন্য তা থেকে খরচ করা হ'ত। বিশেষ বিশেষ বিপ্লবের কর্মীরা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে হেম বাবুর বাটীতে যেয়ে রিভলবার ছোঁড়া অভ্যাস করতেন। মাঝে মাঝে হেম বাবুও সকলকে নিয়ে শীকারে যেতেন।

এই সময়ে কলিকাতায় স্বদেশী ভাব প্রচার করবার জন্য নীলুবাবু উত্তম কথকতা ক'রতেন। সত্যেন কোন-কিছুর অনুষ্ঠান বা পর্ব উপলক্ষে চাঁদা করে বা বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা তাঁকে আনিয়ে মেদিনীপুর শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে কথকতার জলসা করতেন। এই সকল কাজে সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যম উৎসাহের অন্ত ছিল না।

[ছয়]

ক্ষুদিরাম ও সত্যেন্দ্রনাথ

আমি ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে
ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিলে॥

—কাব্যবিশারদ

বাঙলার প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম বসু বাল্যকালে পিতা-মাতা হারিয়ে সংসার-সমুদ্রে পড়ে' ঝড় ও তুফানের দাপটে দোল খেতে খেতে অবশেষে মেদিনীপুরে এসে ঠেকেন। বিষয়-আশয় যা-কিছু ছিল তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনেরা সবই হজম করে নেন। তারপর শিশু ক্ষুদিরামের সহিত সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে তাঁরা একনিষ্ঠ স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

সত্যেন্দ্রনাথ তখন মেদিনীপুরে ফিরে আসর গরম করে তুলেছেন। তাঁর নাম ছাত্র মহলে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। ক্ষুদিরামের সহপাঠীরা তাঁর সৎসাহসে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য বলেন। তাঁদের কথামত

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ক্ষুদিরামের আগ্রহাতিশয্যে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে আপনার করে ...ন নিলেন।

তিনি যেমন অন্য চেলাদের দীক্ষা দেবার পূর্বে জিগ্যেস করতেন সেই রকম ক্ষুদিরামকেও জিগ্যেস করেন, "দেশের জন্য মরতে পারিস ?" তাঁর উত্তরে ক্ষুদিরাম দ্বিধাশূন্য সহজভাবে বলেন, 'পারব বই কি'।

এখান থেকেই ক্ষুদিরামের বিপ্লবী-জীবনের প্রথমাঙ্ক। সাধারণ বাঙালীর নিরীহ জীবন যাপন থেকে সবিনয়ে ছুটি নিয়ে তিনি বিদ্রোহ জীবন বরণ করে নেন। অত্যল্পকালের মধ্যেই ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর কেন্দ্রের মধ্যে লাঠিখেলা, অসি প্রভৃতি খেলায় বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেন। তাঁর পরোপকারপ্রিয়তা ও অলৌকিক সাহসিকতা তাঁকে সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয় করে তুলে।

১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের বিজয়-ডঙ্কা চারদিকে বেজে উঠে। সে আহ্বানে ক্ষুদিরাম ভগ্নীর আশ্রয়ই হউক আর সংসার আশ্রমই হউক পরিত্যাগ করে চিরদিনের জন্য স্বদেশ আশ্রমের ঝুলি গ্রহণ করেন।

এই সময় থেকে তাঁর কাজ হল লাঠি-খেলার পরিসর বৃদ্ধিকল্পে আয়োজন করে বেড়ানো, আর বিলিতি মাল বয়কটের ছলে বিলিতি কাপড় পোড়ানো, বিলাতি কাপড়ের গাঁট লুট করা, অথবা বিলাতি লবণের নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া।

এতদ্ব্যতীত পিস্তল অভ্যাস করা, প্রাচীর ডিঙ্গানো প্রভৃতি শেখাও বাদ পড়ত না।

ক্ষুদিরামের চরিত্র কঠোর-কোমলে গড়া ছিল। তা তাঁর মন্ত্রগুরু সত্যেন্দ্রনাথ হইতে পাওয়া। কারও কোন বিপদপাতে ক্ষুদিরাম ও সত্যেন্দ্রনাথ উভয়েই জীবন-পণ করে লেগে যান। আবার দেশের মঙ্গলের জন্য কারও বিরুদ্ধে লাগলে তেমনি মৃত্যুপণ করে তার লাঞ্ছনার এক শেষ করে ছাড়েন।

কাঁসাই নদীর বান, গ্রামে আগুন লাগা, অথবা ওলাউঠা. বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবে তাঁরা তাঁদের জীবন কতবারই-না বিপন্ন করে তুলেছেন কিন্তু কোনক্রমেই তাঁদের পরোপকার-পরায়ণতার হ্রাস হতে দেখা যায় নি।

১৯০৬ সালে মেদিনীপুরে যে কৃষি শিল্প-প্রদর্শনী হয় সেখানে 'সোণার বাংলা' নামক একটি 'পাম্পলেট' বিলি করতে যেয়ে ক্ষুদিরাম প্রথম রাজনৈতিক অভিযোগে অভিযুক্ত হন। সত্যেন বাবুই পুস্তিকাখানা বার করেন। এই প্রদর্শনীর সহকারী সেক্রেটারী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথই।

ক্ষুদিরাম ধৃত হলে সত্যেন্দ্রনাথেরই ধমকে পুলিস থতমত খেয়ে তাঁকে ছেড়ে দেয়। পরে ভুল যখন তার ভাঙে তখন ক্ষুদিরাম অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ তখন কালেকটরীতে কেরাণী-গিরি করতেন।

এই মোকদ্দমায় সংস্পর্শে হাকিমের সঙ্গে হেসে হেসে উত্তর করায় তাঁর চাকুরীটি যায়।

ক্ষুদিরাম তাঁরই পরামর্শ-মত কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থেকে পরে ধরা দেন। ধরা দেবার পূর্বে অবশ্য তাঁকে কোন প্রকার স্বীকারোক্তি না করার জন্য নানাভাবে বুঝানো হয়। তার প্রত্যুত্তরে ক্ষুদিরাম যা বলেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ধরা দেবার জন্য অনুমতি দেন।

ক্রমে মোকদ্দমা সেসনে যায় কিন্তু গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে এ মোকদ্দমা তুলে নেওয়ায় সেখানেই তার যবনিকাপাত হয়।

এদিকে সত্যেন্দ্রনাথও চাকরী থেকে বিমুক্ত হয়ে স্বদেশের কাজে একমনে আত্ম-নিবেদন করেন।

এর অব্যবহিত পরই সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষুদিরামকে কাঁথিতে পাঠান, সেখানে লাঠিখেলার আখড়াদি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। ক্ষুদিরামও সানন্দচিত্তে সে কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। এসব কাজে ক্ষুদিরামের বিশেষ তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তার পরেই মজঃফরপুরের ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। মজঃফর-পুরের জজসাহেব মিঃ কিংস্ফোর্ড নানাকারণে কলিকাতার বিপ্লববাদীদের অপ্রীতিভাজন হন। এই জন্যই গুপ্ত-সমিতি থেকে তাঁর প্রাণনাশের আয়োজন হয়।

হত্যাকাণ্ডের ৪।৫ দিন পূর্বে তাঁরা মজঃফরপুর গমন করেন। প্রাণ নেবার ভার পড়ে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের ওপর। ফুলার সাহেবের হত্যা সংস্পর্শে ক্ষুদিরাম খুব আগ্রহ দেখান। নানাকারণে তখন তাঁকে পাঠান হয় না। হেমচন্দ্রের অনুরোধে এই কাজে তাঁকে পাঠানো স্থির হয়।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গাড়ি ভুল করে মজঃফরপুরের কিংস্ফোর্ড সাহেবের পরিবর্তে মিসেস ও মিস কেনেডিকে তাঁরা বোমা দিয়া হত্যা করে বসেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই কলিকাতার পথে মোকামা ঘাটের পুলিস কর্মচারী নন্দলালের নির্দেশমত কয়েকজন কনেস্টবল কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে দুর্ধর্ষ প্রফুল্ল চাকী গুলিবৃষ্টি করে পলায়ন করার চেষ্টা করেন। পরে তা একান্ত অসম্ভব বলে মনে হলে তৎক্ষণাৎ তিনি নিজের পিস্তলে আত্মহত্যা করেন। ঐদিকে ক্ষুদিরামও ওয়াইনি ষ্টেশনে ধৃত হন ও পরে ১৩১৫ সালের ছাব্বিশে শ্রাবণ হাসতে হাসতে ফাঁসীর মঞ্চে 'জীবনের জয়গান' গেয়ে ঝুলে পড়েন।

সত্যেন্দ্রনাথের নিকট ক্ষুদিরাম "দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারেন" বলে যে কথা প্রথম দিন দেন, তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কোন্ লোকে চলে গেলেন কে বলবে?

[সাত]

পুলিশের কবলে সত্যেন্দ্রনাথ

মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন দেরে মায়ের তরে,
আবার জীবন পাবি রে ভাই জগৎ-মায়ের ঘরে।
কি দিয়েছিস লিখবে যখন পরকালের খাতা
তখন, তোরই দানে হবে আলো বইয়ের প্রথম পাতা,—

—যতীন্দ্রমোহন

সেদিন রবিবার। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাগরিত হয়ে মেদিনীপুরের অধিবাসীরা শহরের পাড়ায় পাড়ায় পুলিস প্রহরীদের আবির্ভাব দেখে ভয়-বিহ্বল হয়ে পড়ল। রাত্র চারিটা থেকেই সঙীনযুক্ত বন্দুক হস্তে পুলিস-প্রহরীরা সত্যেন্দ্রনাথের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাড়ি অবরোধ করে দাঁড়ায়।

একই সময়ে শ্রীযুত শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৈলাসদাস মহাপাত্র, প্যারীচরণ দাস, প্যারীলাল ঘোষ মহোদয়গণের গৃহও সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়।

প্রভাত হওয়ামাত্র খানাতল্লাসী আরম্ভ হয়। এ পর্যন্ত মেদিনীপুরে রাজনৈতিক সম্পর্কিত কোনপ্রকার ব্যাপারে পুলিসের এমন অভিযান আর হয় নি, তেমন কোন গোলযোগও ছিল না! হঠাৎ পুলিস-আবির্ভাবে জনসাধারণ বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

পরে প্রকাশ পায়, এসব অনুসন্ধান মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর অনুষ্ঠিত বোমা-বিভ্রাটের সংস্পর্শে।

উকিল শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে একটি নোট বুক পাওয়া যায়—জাতীয় বিদ্যালয়ের এবং জাতীয় মধ্য-সমিতি সম্বন্ধীয় নানাকথা নাকি তাতে লিখিত ছিল।

উকিল উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে দু'খানা তরবারি ও একটি বেয়নেট পাওয়া যায়। একখানি পত্রও পাওয়া যায়। তা নাকি উপেনবাবুর কনিষ্ঠ ছেলে যোগজীবনের হস্তলিখিত এবং তাতে অসি-খেলার কথা লিখিত ছিল। পুলিসেরা যোগ-জীবনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

জ্ঞানেন্দ্র-বাবুর বাড়িতেই সর্বাপেক্ষা পুলিসের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। স্বয়ং জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নেলসন ও পুলিসের বড় সাহেব মিঃ কর্ণিস ভোর থেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শেষ রাত্রে হঠাৎ সত্যেন্দ্রবাবুর দাদা জ্ঞানবাবুর ঘুম ভেঙে যাওয়াতে জানালার বাইরে বুটের চাপা শব্দ শুনতে পান।

তখনই আসল ব্যাপারটা তাঁর মনে জেগে উঠে। তাই তিনি অতি সন্তর্পণে জানালা একটুখানিক খুলে যা সন্দেহ করছিলেন তাই দেখতে পান। খুব সাবধানে পাশের ঘরে সত্যেন্দ্রনাথকে ডেকে লাল পাগড়ীওয়ালারা দলে দলে কেমন পা টিপে টিপে জানালার বাইরে চলাফেরা করছে তা দেখান। তৎক্ষণাৎ তাঁরা কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জিনিস চালের মধ্যে গুঁজে রাখতে-না-রাখতে পাশের বাড়ি থেকে সংগৃহীত একখানা মইযোগে দেওয়াল টপকে পুলিস বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে।

ডিপুটী পুলিস-সুপারিনটেনডেণ্ট পারিষদবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে অনুসন্ধানকার্যে তৎপর হন। শয্যাতল থেকে পায়খানা অবধি কোথাও খানাতল্লাসের চোট থেকে রক্ষা পায় নি। জলের কলসীর জল ফেলে, চালের বস্তার চাউল ঢেলে ঘরময় করে, ঘরের ছাউনী (চাল) ছিঁড়ে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অনুসন্ধান চলে। প্রাণান্ত পরিশ্রমে যা তারা সংগ্রহ করে সযত্নে নিয়ে যায় তা এই—

১। বাক্স ও যন্ত্রাদি সমেত একটি দোনলা বন্দুক।

২। দুইটি কুকরী (ভুজালী)।

৩। গুলোল খাড়া ও দুটো তীর।

৪। লাঠি চৌদ্দটি।

৫। জুতোর কালি প্রস্তুত করবার জন্য তিনটি রংয়ের ছোট ছোট টীনের কৌটা।

৬। Rose-buds নামক একটি ইংরেজী কবিতাপুস্তক।

৭। স্বদেশ রেণু, জাতীয় সমস্যা, রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন নামক বই।

এতদ্ব্যতীত কয়েকখানা পত্র, একটি দান-পত্র, রাখি-বন্ধন পত্র, সুবোধ বাবু প্রভৃতির কয়েকটি কোট, একটি চালান ইত্যাদি।

তৎসঙ্গে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখবার অপরাধে সত্যেন্দ্রনাথকে পুলিস গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পুলিস বলে, ক্ষুদিরামের নিকট পাওয়া পিস্তলটি সত্যেন্দ্রনাথের দেওয়া।

পুলিস জানত যে ক্ষুদিরাম তাঁর নিকটই থাকতেন। সত্যেন্দ্রনাথ পুলিসের অভিযোগ অস্বীকার করেন। শরৎচন্দ্র সিংহকেও ধৃত করা হয়। তার গৃহকোণে একটি তরবারি পাওয়া যায়।

জ্ঞানেন্দ্রবাবুকেও ১০০৲ টাকার জামানে ছাড়া হয়। বাকি তিনজনের মধ্যে কাউকেই জামানে খালাস দেওয়া হয় নি। সত্যেন্দ্রনাথ, যোগজীবন এবং শরৎচন্দ্র বন্দুক ও তরবারি নিয়ে রাজপথে পরিভ্রমণ করেন এবং আখড়ায় তা নিয়ে খেলা করেন এই অপরাধে অস্ত্র-আইনে অভিযুক্ত হন। মোকদ্দমায় জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নেলসন যোগজীবন ও শরৎচন্দ্রকে মুক্তি দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথকে দুই বছরের জন্য কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু

ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওয়েস্টন তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে যোগজীবন ও শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে পুনরায় ঐ অভিযোগ আনেন।

যে সাক্ষী অবিশ্বাস করে যোগজীবন ও শরৎচন্দ্রকে প্রথম বারে মুক্তি দেওয়া হয় সেই সাক্ষীকেই পুনরায় বিশ্বাস করে তাদের একমাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মুরারী পুকুরের ষড়যন্ত্র মামলা বা আলিপুরে বোমার মামলার সহিত সত্যেন্দ্রনাথের সম্পর্ক আবিষ্কার করে মেদিনীপুর জেল থেকে আলীপুর জেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়।

[আট]

গোঁসাই-বধের আয়োজন

বিনাপাশে জ্ঞানেন্দ্রনাথের বন্দুক নিয়ে রাজপথে বেড়ানো ও আখড়ায় নিয়ে যাওয়ার অজুহাতে মেদিনীপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে সত্যেন্দ্রনাথের দু'বছরের কারাদণ্ড হয়। বোমার মামলার সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে তাঁকে আলিপুর জেলে নিয়ে আসা হয়। নানা অসুখ-বিসুখের অছিলায় আলীপুর জেলবাসের সমস্ত সময়ই সত্যেন্দ্রনাথ জেল-হাসপাতালে কাটিয়ে দেন। অবশ্য এই অসুখ-বিসুখ অনেকটা কল্পিতই ছিল।

আলিপুর জেলে এসেই সত্যেন্দ্রনাথ নরেন গোঁসাইর 'রাজ-সাক্ষী' হবার কথা জেনে মুস্কিল আসানের পথ উদ্ভাবন করতে উঠে পড়ে লেগে যান। অবশেষে পথ যখন স্থির হল, তখন তিনি স্বীয় মতাবলম্বী হেমচন্দ্রের সঙ্গে পত্র আদান-প্রদানের মারফত আলোচনা চালান। হেমচন্দ্র অন্যান্য বন্দীদের

সঙ্গে তখন একত্র ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে তিনখানি চিঠি লিখে জানতে চান, বিপ্লবীদের মধ্যে নরেনের মত আর কেউ ছিল কিনা ? আর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারা যায় এমন কে কে ছিল। "নরেন যে-সকল খবর পুলিসকে দিচ্ছে, তা বাইরে আমাদের লোককে জানিয়ে সাবধান করা নিতান্ত আবশ্যক। খবর জানবার অন্য উপায় না থাকলে, নরেনের জুড়ীদার approver অর্থাৎ corroborator হওয়ার ভাণ করে নরেনের সঙ্গে ভাব করা উচিত কিনা; আর নরেনকে হত্যার উপায় কি হতে পারে।" [বাঃ, বিঃ, প্রঃ, ৩১৩ পৃঃ]

পত্রালোচনায় সত্যেন্দ্রনাথ জানতে পারেন, গোঁসাইর মত দুর্বল প্রকৃতির বিপ্লবী তখন আর কেউ নেই এবং "সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ব'লে যে কয়জনকে মনে করেছিল, তাদের অধিকাংশই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে ছোকরা আর বাকী নেহাৎ ভাল মানুষ বললে যা বোঝায় তাই।" [বাঃ, বিঃ, প্রঃ]

সত্যেন্দ্রনাথ আলীপুর জেলে এসে এও শুনতে পান যে জেলের মধ্যে এবং কোর্টের বাইরে দু'স্থানে দু'ভাবে গোঁসাইকে আক্রমণ করে হত্যা করবার প্রস্তাব যখন হয় তখন নেতারা, বিশেষ করে, বারীন্দ্রকুমার এই বলে ঘোরতর ভাবে আপত্তি তোলেন যে অরবিন্দও তাতে জড়িয়ে পড়বেন। বিশেষ করে, জেলের মধ্যে যে-কোন কথা হয় বৈপ্লবিক আসামীরা, তা কোর্টে যেয়েই আপন

আপন উকিল ব্যারিস্টারদের না বলে থাকতে পারেন না। তাই নরেন গোঁসাইর হত্যাসাধনই একমাত্র উপায় বলে যখন স্থির হল তখন সত্যেন স্বয়ং এই ব্যবস্থার ভার নিজ হাতে নেন। তখন তিনি জেলের মধ্যেকার কোন বিপ্লববাদীকে এই গোঁসাই-হত্যার মতলব জানতে দেওয়া ঠিক হবেনা বলেই স্থির করেন।

"খুব বিশ্বাসী, কৌশলী, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি এবং স্মরণশক্তিসম্পন্ন অন্য ব্যক্তির অভাবে" তিনি নিজেই গোঁসাইর সঙ্গে রাজসাক্ষী বা তাঁর corroborator হবার ভাণ করতে স্থির-সংকল্প হন।

এইরূপ কাজে হাত দেওয়া যে কিরূপ বিপদজনক, এর ফল যে কতদূর গড়াতে পারে তা তিনি বেশ ভালভাবে বুঝে-সুঝেই এ কাজে প্রবৃত্ত হন। তাঁর উদ্দেশ্য লোকের কাছে অজানিত থাকা কিম্বা নরেনের মত স্বদেশদ্রোহী বলে ঘৃণিত হওয়াও বিচিত্র নয়। তা সত্ত্বেও তিনি এ কাজে প্রবৃত্ত হন।

সত্যেনের আসার আগে বারীন্দ্রকুমার জেলখানায় অনেকগুলি রিভলবার এনে সকল রাজবন্দীর একযোগে পলায়ন করার অলীক স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। এজন্য নির্দিষ্ট প্ল্যান আঁটা হয় কিন্তু যথাসময়ে এখবরও পুলিসের কানে যায় এবং অতিরিক্ত সতর্ক প্রহরী বসানো হয় কারা-প্রাচীরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থানে। বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ নেতারা বাইরের লোকের উপর নরেন

গোঁসাইর হত্যার ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু নরেন গোঁসাইর হত্যার ভার যেসব বাইরের দলভুক্তদের ওপর পড়ে তাঁরা তখন নিজেদের পৈতৃক প্রাণ বাঁচাবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠেছেন। পুলিসের অত্যাচারে সবাই "চাচা আপন জান বাঁচা" পথ গ্রহণ করেছেন। তাই সেদিক থেকে কোন সাহায্য আসা অসম্ভব বলে সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন।

মেদিনীপুরে সত্যেনের জানা মত যে সমস্ত পিস্তল ছিল তা আনয়নের চেষ্টা করতে যেয়ে তিনি শোনেন যে সেখানকার সব বিপ্লবী "কুর্ম অবতারে" পরিণত হয়েছেন। তাই সত্যেন্দ্রনাথ হেমবাবুকে বলে পাঠান বারীন্দ্রকুমারের পরিকল্পনানুযায়ী প্রথম রিভলবারটি জেলে আসামাত্রই যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হাঁসপাতালে যাওয়া হেমবাবুর পক্ষে নিষিদ্ধ থাকা সত্বেও তিনিই প্রথম রিভলবারটি আসামাত্র তা নিয়ে হাসপাতালে যেয়ে উপস্থিত হন। এবারও তাঁকে হাঁসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং পুনর্বার সাবধান করে দেওয়া হয়, ফের হাঁসপাতালে যেন তিনি না আসেন।

এদিকে হঠাৎ একদিন চুয়াল্লিশ ডিগ্রি থেকে সকলকে সরিয়ে এনে ছ'ডিগ্রিতে একসঙ্গে রাখা হয়। একসঙ্গে রাখার কারণ সবাই বুঝতে পারে। হঠাৎ গোঁসাইর জ্ঞান-পিপাসা বেড়ে উঠে, যাঁর কাছ থেকে যতদূরসম্ভব গুপ্ত-সংবাদ আদায় করতে

তিনি উঠে পড়ে লাগেন। কয়েকজন তাঁকে সম্ভব-অসম্ভব গুপ্ত তথ্য এবং ভুয়া নেতার নামধাম বলেন। ছেলেদের কেউ কেউ বিশেষ করে সুশীল সেন নরেন গোঁসাইকে গলাটিপে বা ইটের আঘাতে হত্যা করতে চান। সবাই নরেনকে অত্যন্ত ঘৃণা করতে থাকেন। কৃষ্ণজীবন নামে একটি ছেলে তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে একদা এক লাথি বসিয়ে দেন!

ফলে গোঁসাইকে সরিয়ে নিয়ে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে রাখা হয় এবং দু'দু'জন য়ুরোপীয় কয়েদী গার্ড শরীরক্ষীরূপে দেওয়া হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, অসুখের ভাণ করে প্রথম থেকেই সত্যেন হাসপাতালেই থাকার বন্দোবস্ত পাকা করে নেন। সেখান থেকেই গোঁসাইকে খবর পাঠান জেলের টানা-হ্যাচড়া আর আর তাঁর সহ্য হয় না। দণ্ডের ভয়ে তিনি রাজসাক্ষী হতে রাজি। গোঁসাই উপরিয়ালা পুলিস কর্তৃপক্ষকে খবর দেন। পুলিস কর্তৃপক্ষও সত্যেনের ইচ্ছা অকৃত্রিম কিনা তা যাচাই করে খুশী হয়ে তাঁর রাজসাক্ষী হবার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। নরেন তাঁকে যথোপযুক্তভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার ভার নেন। গোঁসাই পুলিসে যে-সব খবর দেন সত্যেন যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে তা পাঠাতে থাকেন। কিছুদিন ধরে তাঁর এ অভিনয় কার্য চলে।

বিভিন্ন আড্ডায় খানা-তল্লাসের কালে যেসব অস্ত্রশস্ত্র পুলিস পায় তা নাকি আদালত-গৃহের মধ্যে একখানা কেরোসিন বাক্সে সামান্য একটি তালায় বন্ধ করে মজুত রাখা হয়। এই তালা ভেঙ্গে এসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই ছেলেরা সার্জেণ্টদের পিস্তল দেখিয়ে যে যেদিকে পারে উধাও হয়ে যাবেন। এ নাকি ছিল প্রথম প্ল্যান। অরবিন্দকে জড়াবে বলে তাতেও বাধা দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় প্ল্যানে ছিল পনেরটা রিভলবার জেলের ভিতরে গলিয়ে সবাই একসঙ্গে পালিয়ে কাবুলে চলে যাবেন। রিভলবার জোগাড়ের ভার দেওয়া হয় বাইরের লোকের ওপর। ফলে, বাইরে থেকে নরেন গোঁসাইর হত্যার কাজ চাপা পড়ে যায়। চাপা পড়ার এও অন্যতম কারণ।

কাজের কাজী সত্যেন এসবে ভোলার পাত্র নন। তিনি ছ'ডিগ্রিতে তাঁর বন্ধুকে বলে পাঠান, জেল পলায়নের পরিকল্পনা-নুযায়ী প্রথম রিভলবারটা আসা মাত্রই যেন হাসপাতালে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এখানকার মত কড়াকড়ি নিয়ম-কানুন না থাকায় সে সময়ে বাইরে থেকে রিভলবার ভেতরে গলান খুব কঠিন ছিল না। এই কারণেই ১৫।১৬-টা রিভলবার জেলের ভেতরে নেওয়ার পরিকল্পনা হয়। তবে সে সময়ে বাইরে এতগুলো রিভলবার জোগাড় করাই ছিল কঠিন ব্যাপার।

যাই হোক, মরচে-ধরা মস্ত বড় পুরানো ধরণের একটা রিভলবার এসে পৌঁছলে সেটা সংগোপনে রাখার ভার পড়ে সত্যেনের সেই বন্ধু হেমবাবুর ওপর। বাকী ক'টা রিভলবার না এলে তো আর জেল পালানো যায় না! তাই প্রথম রিভলবারটার কথা প্রায় সকলেই ভুলে গেছে এমনি এক সময়ে সত্যেনের বন্ধু সকলের অজ্ঞাতসারে সেটি নিয়ে হাসপাতালে সত্যেনকে দিয়ে আসেন। সেটার ট্রিগারটা খুব শক্ত থাকায় তাঁর পক্ষে এইটে সহজ হবে না মনে ক'রে আর একটা পিস্তল না আসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করে থাকেন।

সত্যেন রাজসাক্ষী হতে যাচ্ছে এখবর বিপ্লবীদের মধ্যে প্রচার করা হয়। বলাবাহুল্য, উকীল বারিস্টারদের মারফত এখবর বাইরেও রাষ্ট্র হয়।

গোঁসাই, তাঁর আত্মীয়-পরিজন, সরকার বাহাদুর সকলেই বুঝেন গোঁসাইর জীবন সংকটাপন্ন। রাজকর্মচারীরা তাঁকে আলীপুর জেলের মধ্যে য়ুরোপীয় ওয়ার্ডে অতি সাবধানতার সঙ্গে সর্বদা প্রহরীবেষ্টিত করে রাখেন। গোঁসাই য়ুরোপীয় ওয়ার্ডে থেকে ভাল ভাল আহার করতেন বটে কিন্তু স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে পারতেন না, সর্বদাই সশঙ্কচিত্তে তাঁর কাল কাটাতে হত। হাসপাতালে যেতে হলে তিনি প্রায়ই

হিগিন্‌স বা লিণ্টন নামক দু'জন শ্বেতাঙ্গ কয়েদীর একজনকে নিয়ে যেতেন।

সত্যেন্দ্রনাথ গোঁসাইকে দিনের পর দিন হাসপাতালে ডেকে এনে তাঁর সঙ্গে খুব খাতির জমিয়ে তোলেন। Corroborator-রূপে সত্যেনকে পেলে সত্যেনের মত লোক যদি অপরাধ স্বীকার করে তাহলে গোঁসাইকে আর পায় কে! দণ্ড মকুবের সঙ্গে সঙ্গে সপরিবারে বিলাতে রাজার হালে থাকা আর তাঁর ঠেকায় কে!

প্রায় প্রতিদিনই গোঁসাই সত্যেনের সঙ্গে হাসপাতালে যেয়ে দেখা করেন। আগের দিন গোঁসাই সত্যেনকে যে যে ভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে যান, যে ভাবে যে কথা বলতে বলে যান পরের দিন সত্যেন তা ওলট-পালট করে জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে তাঁকে শোনান। দু'জনের এজাহারে যাতে সঙ্গতি থাকে তার জন্য নরেন তাঁর এজেহার আবার পড়ে সত্যেনকে শোনান, সতর্ক হতে উপদেশ দেন। সত্যেন আবার ভাল করে শেখার ভাণ করেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর আর মনে থাকে না! অগত্যা স্মরণ শক্তিহীনতার দোহাই পেড়ে তিনি লিখিত এজাহার এজলাসে পড়ার অনুমতি চান। বলা বাহুল্য, পুলিসের কর্তা সানন্দে তা মঞ্জুর করেন। তাই এবার লেখার পালা চলে। রোজ একটু একটু করে এজাহার লেখা হয়। বেশি লিখলে মাথায় ধরা

অপারিহার্য হয়ে ওঠে। কোর্টে মোকদ্দমা থাকলে শুধু সকালে আর মোকদ্দমা না থাকলে সকালে বিকালে দুবেলাই লেখা চলে।

৩১শে আগস্ট পর্যন্ত এ লীলা চলে। পরের দিন ১লা সেপ্টেম্বর দেবব্রত, ইন্দ্রনাথ, যতীন বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ আট জনের বিরুদ্ধে গোঁসাইর জবানবন্দী দেবার কথা।

সত্যেন্দ্রনাথ গোঁসাইর কাছে জানেন, আরও অনেক নতুন নাম সে দিন প্রকাশ হবে, এবং বহু গণ্যমান্য লোক ধৃত হবে। তাই এই দিনের জবানবন্দীর পূর্বেই গোঁসাইকে ঠাণ্ডা করা দরকার। ছ'ডিগ্রিতে বন্ধুর কাছে এখবর সত্যেন যথাসময়ে পাঠিয়ে দেন।

এর মধ্যে দ্বিতীয় রিভলবারটিও জেলের মধ্যে এসে পৌঁছে। কিন্তু সত্যেনের কাছে তা পাঠানোও এক সমস্যা। হেমরবাবু হাসপাতালে যাওয়া বিশেষভাবে মানা। ১লা আগস্টের আগের দিন বিকেল পাঁচটার পূর্ব পর্যন্ত গোঁসাইর হাসপাতালে থাকার সম্ভাবনা। জেলে খাওয়া-দাওয়া হয় ৫টার সময়, তখন গোঁসাই তাঁর ওয়ার্ডে ফিরে যান। তাই পাঁচটার পর হেমবাবু রিভালবারটি একটি ন্যাকড়ায় ভাল করে জড়িয়ে কানাইলালকে দিয়ে হাসপাতালে সত্যেনের কাছে পাঠিয়ে দেন। পেট কামড়ানির অজুহাতে কানাইলাল হাসপাতালে যান এবং সত্যেনের হাতে তা দেন। সত্যেন্দ্রনাথ বড় রিভলবারটা কাপড়ে

জড়িয়ে কানাইলালকে দেন হেমবাবুরর কাছে দিতে। এটা যে রিভলবার তা তিনি সহজেই এবার বুঝতে পারেন। মুহূর্ত কাল আগেও কানাইলাল গোঁসাই-হত্যার এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না।

ভয়ানক একটা-কিছু ব্যাপার চলছে মনে করে কানাইলাল সত্যেনকে নাছোড়বন্দা হয়ে ধরেন, প্রকৃত ব্যাপার কি জানতে তাঁর ঐকান্তিকতা দর্শনে সত্যেন মুগ্ধ হন এবং প্রকৃত ব্যাপার খুলে বলেন। কানাইলাল তাঁকে তাঁর সহকারীরূপে নিতে পীড়া-পীড়ি করতে থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে রাজি হন না, পরে তাঁর আগ্রহাতিশয্যে হেমবাবুর সম্মতি দরকার বলে জানান। কানাইলাল তাঁর সম্মতি আদায়ের জন্য তাঁর কাছে একখানা খুব যুক্তিপূর্ণ ও অনুনয়পূর্ণ পত্র দেন। হেমবাবু আবার কানাইয়ের জনৈক অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত জানতে চান। কানাইলালের বন্ধু অবাক্‌বিস্ময়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েন ঘটনার কথা শুনেই—মতামত কিছুই দেন না। যা-হোক সত্যেনের বন্ধু অগত্যা সম্মতি দিয়ে পাঠান।

মতামত পেয়ে সত্যেন ও কানাই স্থির করেন আগে সত্যেন চেষ্টা করবেন, কোন কারণে তা ব্যর্থ হলে কানাইলাল চেষ্টা করবেন সত্যেন্দ্রনাথ ডিস্পেনসারীর মধ্যে গোঁসাইকে ডেকে এনে হত্যার চেষ্টা করবেন; কোন কারণে তিনি অকৃতকার্য হলে

কানাই ডিস্পেনসারীর বারান্দা থেকে যথাযোগ্যভাবে আক্রমণ চালাবেন। দাঁতন নিয়ে দাঁত মাজার ছলে তিনি বারান্দায় উপস্থিত থাকবেন সশস্ত্র হয়ে।

কানাইলাল সত্যেনের সহকারী না হলে এবারও যে রগ ঘেসে কার্য পণ্ড হত, গোঁসাই বধ পর্ব অসমাপ্তই থেকে যেতো. তাতে সন্দেহ নেই।

[নয়]

বিশ্বাস-ঘাতক নরেন গোঁসাই

বিশ্বাস-ঘাতক নরেন গোঁসাই শ্রীরামপুরের জনৈক ধনী জমিদারের বিলাসে-লালিত একমাত্র দুলাল! যৌবনারম্ভে যত প্রকার দুর্নীতিপরায়ণ হওয়া সম্ভব তার কিছুই তাঁর বাকি ছিল না। এমন-কি কুব্যাধিগ্রস্তও নাকি তিনি ছিলেন। বকাটেগিরির চূড়ান্ত করে হঠাৎ স্বদেশে-প্রেমিক হওয়ার বাসনা তাঁর জাগে। ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে রামদাস মুখোপাধ্যায় ও সুরেন ব্যানার্জীর (বাকুড়ার) পত্র নিয়ে হঠাৎ তিনি কলিকাতায় চলে আসেন এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য 'যুগান্তর' আফিসে যান। চালচলনে চলনসই না হওয়ায় অবিনাশ ভট্টাচার্য অবহেলা ভরে তাঁকে ভূপেন্দ্রনাথের বাড়ীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। ভূপেন্দ্রনাথ পত্র পড়ে জানেন, গোঁসাইকে ইতিপূর্বেই দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। বিপ্লবের কাজে তাঁর বিশেষ উৎসাহ দর্শনে এক্ষণে তাঁকে কেন্দ্রে পাঠান হয়।

ভূপেনবাবু তখন নরেন গোঁসাইকে বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। .বারীন্দ্রকুমারের কাছে গোঁসাই বলেন যে, স্বদেশী ব্যাপার নিয়ে তাঁর পিতার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে—তিনি আফসে থাকতে চান। প্রকৃতপক্ষে, চরিত্রহীনতা ও অন্যান্য কারণের জন্য তাঁর পিতা অসন্তুষ্ট হন, এমন-কি, ত্যাজ্য-পুত্র করতে চান। এসব ব্যাপার গোঁসাই চেপে যান, স্বদেশীর নাম করে বারীন্দ্রকুমারের মন ভুলান। ভূপেনবাবু বলেন, "গোস্বামীর সঙ্গে আমার কখন ভাল মেশামেশি হয় নাই; অর্থাৎ তাহার কলিকাতার ছোকরাই চালচলন দেখিয়া আমি তাহার কাছ হইতে দূরে থাকিতাম কিন্তু বারীন তাহার সঙ্গে মেশামেশি করিত। পরে নাকি বারীনের কাছে আত্মজীবনী বিবৃত করিয়াছিল যে সে বকামীর চূড়ান্ত করিয়াছে। সে কুৎসিত ব্যারাম গ্রস্ত হইয়াছিল ও পিতা তাহাকে ত্যাজ্য-পুত্র করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার সে সব দুর্নীতি দূর হইয়াছে। এক্ষণে সে প্রবৃত্তিমার্গের চূড়ান্ত করিয়া নিবৃত্তিমার্গে আসিয়াছে ও পূর্ব-কর্মের জন্য বিশেষভাবে অনুতপ্ত। এই প্রকার চরিত্রের লোককে আমাদের গুপ্ত-সমিতিতে সভ্য করায় ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। তবে এস্থলে তাহার বিগত চরিত্র বলেই আমরা তাহাকে মাপ করিয়া নিয়াছি। আমরাও ইহাকে Prodigal son বলিয়া ভাল কার্য্য করিবার

সুযোগ এইজন্য দিয়াছিলাম যে তাহার পূর্বের চালচলন তখন সে ছাড়িয়া দিয়াছিল।”

নরেন গোঁসাই দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। গায়ের রং ছিল খুব ফর্‌সা, বেশ বলিষ্ঠ, লম্বাও খুব। চোখেমুখে তাঁর কুপ্রবৃত্তি প্রকাশক ভাব ছিল সুস্পষ্ট, বেশ চটপটে এবং নির্ভীক হলেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যেত না। তাঁর কথাবার্তায় নির্বুদ্ধিতা ও লঘুপ্রকৃতির ভাব ফুটে উঠত। যুগান্তর আফিসে থাকার সময় তিনি ‘ভবানী মন্দিরে’র নাম করে চাঁদা উঠাতে চাইতেন। বড় বড় দাতাদের নাম জানার তাঁর এ কৌশলমাত্র। বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে তিনি প্রায়ই ডাকাতির কল্পনা-জল্পনা করতে ভালবাসতেন।

বোমার মামলায় আসামীদের স্বীকারোক্তির ফলে শ্রীরামপুরের আরো কয়েকজন যুবকের সঙ্গে গোঁসাইও ধৃত হয়ে আসেন।

অরবিন্দবাবু তাঁর ‘কারাকাহিনীতে’ বলেন, “গোঁসাইয়ের কথা নির্বোধ ও লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হলেও তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল। তাঁহার তখন বিশ্বাস ছিল যে, তিনি খালাস পাইবেন। তিনি বলিতেন, “আমার বাবা মোকদ্দমার কীট, তাঁহার সঙ্গে পুলিস কখনও পারিবে না। আমার এজাহারও আমার বিরুদ্ধে যাইবে না, প্রমাণিত হইবে পুলিস

আমাকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া এজাহার করাইয়াছে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি পুলিশের হাতে ছিলে। সাক্ষী কোথায়?” গোঁসাই অম্লানবদনে বলিলেন, “আমার বাবা কত শত মোকদ্দমা করিয়াছেন, ওসব বেশ বোঝেন। সাক্ষীর অভাব হইবে না। এইরূপ লোকই approver হয়।”

তিনি তাঁর সম্বন্ধে আরো বলেন, “——অন্য বালকদের ন্যায় তাঁহার শান্ত ও শিষ্ট স্বভাব ছিল না, তিনি সাহসী, লঘুচেতা এবং চরিত্রে, কথায় কর্ম্মে অসংযত ছিলেন। ধৃত হইবার কালে নরেন গোঁসাই তাঁহার স্বাভাবিক্ সাহস ও প্রগল্‌ভতা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু লঘুচেতা বলিয়া কারাবাসের যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ ও অসুবিধা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। তিনি জমিদারের ছেলে; সুতরাং সুখে, বিলাসে, দুর্নীতিতে লালিত হইয়া কারাগৃহের কঠোর সংযম ও তপস্যায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, আর সেই ভাব সকলের নিকট প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যে কোন উপায়ে এই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার উৎকট বাসনা তাঁহার মনে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। প্রথম তাঁহার এই আশা ছিল যে নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন যে পুলিস তাঁহাকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া দোষ স্বীকার করাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের নিকট জানাইলেন

যে তাঁহার পিতা সেইরূপ মিথ্যাসাক্ষী জোগাড় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিনেই আর এক ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার পিতা ও একজন মোক্তার তাঁহার নিকট জেলে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, শেষে ডিটেকটিভ শামসুল আলমও তাঁহার নিকট আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এই সময়ে হঠাৎ গোঁসাইয়ের কৌতূহল ও প্রশ্ন করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল বলিয়া অনেকের সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভারতবর্ষের বড় বড় লোকের সহিত তাঁহাদের আলাপ বা ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা, গুপ্ত-সমিতিকে কে কে আর্থিক সাহায্য দিয়া তাহা পোষণ করিয়াছিলেন, সমিতির লোক বাহিরে বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কে কে ছিল, কাহারা এখন সমিতির কার্য্য চালাইবেন, কোথায় শাখা-সমিতি রহিয়াছে ইত্যাদি অনেক ছোট বড় প্রশ্ন বারীন্দ্র ও উপেন্দ্রকে করিতেন। গোঁসাইর এই জ্ঞানতৃষ্ণার কথা অচিরাৎ সকলের কর্ণগোচর হইল এবং শ্যামসুল আলমের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতার কথাও আর গোপনীয় প্রেমালাপ না হইয়া Open Secret হইয়া উঠিল। ইহা লইয়া অনেক আলোচনা হয় এবং কেহ কেহ ইহাও লক্ষ্য করে যে এইরূপ পুলিশ দর্শনের পরই সর্বদা নব নব প্রশ্ন গোঁসাইর মনে ফুটিত। বলা বাহুল্য, তিনি এই সকল প্রশ্নের

সন্তোষজনক উত্তর পান নাই। যখন প্রথম প্রথম এই কথা আসামীদের মধ্যে রাষ্ট্র হইতে লাগিল, তখন গোঁসাই স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন যে পুলিস তাঁহার নিকট আসিয়া "রাজার সাক্ষী" হইবার জন্য তাঁহাকে নানা উপায়ে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আমাকে কোর্টে একবার এই কথা বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি কি উত্তর দিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "আমি কি শুনিব! আর শুনিলেও আমি কি জানি যে তাঁহাদের মনের মত সাক্ষ্য দিব?" তাহার কিয়ৎদিন পরে আবার যখন এই কথা উল্লেখ করিলেন, তখন দেখিলাম, ব্যাপারটা অনেক দূরে গড়াইয়াছে। জেলে Identification parade-র সময় আমার পার্শ্বে গোঁসাই দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন তিনি আমাকে বলেন, "পুলিস কেবলই আমার নিকট আসেন।" আমি উপহাস করিয়া বলিলাম, "আপনি এই কথা বলুন না কেন যে সার আন্‌ড্রু ফ্রেজার গুপ্ত-সমিতির প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।" গোঁসাই বলিলেন, "সেই ধরণের কথা বলিয়াছি বটে। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী আমাদের head এবং তাঁহাকে একবার বোমা দেখাইয়াছি।" আমি স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কথা বলিবার প্রয়োজন কি ছিল?"

গোঁসাই বলিলেন, "আমি···দের শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িব। সেই ধরণের আরও অনেক খবর দিয়াছি। বেটারা corroboration খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরুক। কে জানে, এই উপায়ে মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইতেও পারে। ইহার উত্তরে আমি কেবল বলিয়াছিলাম, "এই নষ্টামি ছাড়িয়া দিন। উহাদের সঙ্গে চালাকী করিতে গেলে নিজে ঠকিবেন।" জানিনা, গোঁসাইয়ের এই কথা কতদূর সত্য ছিল। আর সকল আসামীদের এই মত ছিল যে আমাদের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন; আমার বোধ হয় যে তখনও গোঁসাই approver হইতে সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চয় হন নাই, তাহার মন সেইদিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পুলিসকে ঠকাইয়া তাঁহাদের কেস মাটি করিবার আশাও তাঁহার ছিল। চালাকী ও অসদুপায়ে *কার্য্যসিদ্ধি দুষ্প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রেরণা।* তখন হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, গোঁসাই পুলিসের বশ হইয়া সত্যমিথ্যা তাঁহাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা বলিয়া নিজে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিবেন। একটী নীচ স্বভাবের আরও নিম্নতর দুষ্কর্মের দিকে অধঃপতন আমাদের চক্ষের সম্মুখে নাটকের মত অভিনীত হইতে লাগিল। আমি দিন দিন দেখিলাম, গোঁসাইর মন কিরূপে বদলাইয়া যাইতেছে, তাঁহার মুখ, ভাবভঙ্গী, কথা-বার্ত্তারও পরিবর্ত্তন হইতেছে। তিনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া

তাঁহার সঙ্গীদের সর্ব্বনাশ করিবার যোগাড় করিতেছিলেন, তাহার সমর্থনের জন্য ক্রমে ক্রমে নানা অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্তি বাহির করিতে লাগিলেন। এমন interesting psychological study প্রায়ই হাতের নিকট পাওয়া যায় না।"

[কারাকাহিনী]

নরেন গোঁসাই প্রথম থেকেই পুলিসের গুপ্তচর হিসাবে দলে ঢুকেন কিনা সে সম্পর্কে অনেকের অনেক মত। তন্মধ্যে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, "গোস্বামী আমাকে বরাবর বলিয়াছিল যে পশ্চিম-বঙ্গের এক statutory civilian তাহার বন্ধু। পরে যখন সে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন এই কথাটিই আমার কাণে বরাবর বাজিত এবং ততই মনে আজ পর্যন্ত এই প্রশ্ন উদয় হয় যে গোস্বামীর এই দুই ঘটনার মধ্যে কোন নিগূঢ় সম্পর্ক আছে কিনা। সাধারণের হয়ত বিশ্বাস, গোস্বামী প্রাণের ভয়ে বা জেলের ভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। এমতে আমি সায় দিই না। যতদিন যাইতেছে ততই আমাদের বিশ্বাস বাড়িতেছে যে গোস্বামী প্রথম হইতেই পুলিস-গোয়েন্দা-রূপে দলে ঢুকিয়াছিল। যাহারা গোস্বামীর সহিত আলিপুর জেলে ছিলেন তাহারা আমার এই মতে সায় দেয় না। আমি কেবল আমার মত এইখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই বিষয়ে আমি কাগজপত্রে কোন প্রমাণ দেখাইতে পারি না। আমার বিশ্বাস

circumstantial evidence-এর উপর নির্ভর করে। সে প্রথম হইতে আমাদের দলের মধ্যে ঢুকিতে চায় ও সকলকার সঙ্গে মিশিতে চায়। তাহার প্রথম বুলি হইল আমেরিকায় গিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিবে, দ্বিতীয় দিনে সে বুলি বন্ধ করিল; তারপর হঠাৎ আমাদের আফিসে আস্তানা লইল ও 'ভবানী মন্দির' স্থাপনের জন্য চাঁদা তুলিবে বলিয়া সমিতির মাতব্বর লোকদের সঙ্গে মিশিতে লাগিল। তাহার মতলব কেবল সব লোককে চেনা ও গুপ্ত খবর জানা; তৎপরে সে বুলি অন্তর্ধান হইয়াছিল। পরে বারীনের সঙ্গে ফুসফুস করিয়া ডাকাইতি করার গল্প ফাঁদিত। আমাদের দলে অনেক ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু বারীন ছাড়া কাহারও সঙ্গে তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। তৎপর দেওঘরে ও বৃন্দাবনে গিয়া সাধুবেশে তাহার বিপ্লববাদ প্রচার করিবার সখ হইয়াছিল। এই সব জায়গায় গিয়া সে অনেকের কাছে আবোল-তাবোল বকিয়াছিল। দেওঘরে পূর্ব্ববঙ্গের কোন বিখ্যাত ও ধনী জমিদারের কাছে গিয়া প্রকাশ্যে এই প্রকার আহাম্মকি করিয়াছিল। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি আপনাদের সাবধান করিয়া দিতেছি যে এই লোকটি সন্দেহজনক লোক।" শেষাশেষি সে আর কাহারও সহিত মিশিত না। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর আমাদের আফিসে থাকিত না; হয়ত বাড়ীতে থাকিত, কেবল বারীনের

কাছে আসিয়া ডাকাইতি করার পরামর্শ করিত। গুপ্ত-সমিতির সকল সভ্যের সহিত তাহার আলাপ বা ঘনিষ্ঠতা হয় নাই, কেবল 'যুগান্তর' সম্পর্কীয় লোকদের সহিত আলাপ হইয়াছিল। এই জন্য সকলকে সে ধরাইয়া দিতে পারে নাই। তবে আমরা তাহাকে দলভুক্ত করিয়াছিলাম ও বিশ্বাস করিতাম বলিয়া কেহ তাহাকে অবিশ্বাস করিতেন না। শেষে দেওঘরে গোস্বামী বংশের কোন কোন লোক বারীন ও আমাকে বলিয়াছিলেন, "এই লোকটিকে আপনারা বিশ্বাস করিবেন না।" নিয়তিকে খণ্ডন করিতে কে পারে! এই সদুপদেশে আমরা তখন হাসিয়াছিলাম।

যখন ভাগলপুর জেলে আমি শুনিলাম যে গোস্বামী বিশ্বাসঘাতক হইয়া সরকারী সাক্ষী হইয়াছে তখন আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম কিন্তু পরে তাহার সিভিলিয়ানটীর সহিত বন্ধুত্বের কথা মনে হইল। তখন এই সন্দেহ মনে জাগরিত হইল যে এই সিভিলিয়ানটির প্ররোচনায় কি সে আমাদের দলে ঢুকে নাই? আমার মনে এই তর্ক উপস্থিত হয় যে আমাদের যে-কেন্দ্রে সে সর্ব্বপ্রথম দলভুক্ত হইয়াছিল সেই কেন্দ্রের উপর পুলিস বড়ই উৎপাত করিতেছিল। হয়ত তাহার রাজকর্ম্মচারী বন্ধু তাহাকে বলিয়াছিল যে ইহাদের ভিতর ঢুকিয়া দেখ ব্যাপার কি? সে কেন্দ্রের নেতা অতি কাঁচা লোক। জমিদারের ছেলে দেখিয়া

শীঘ্রই তাহাকে দলভুক্ত করেন ও কলিকাতায় আমাদের কাছে পাঠান। তৎপর সে একজন হইতে আর একজনের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। কেবল সে গুপ্ত-সমিতির বড় বড় পাণ্ডাদের দেখিতে চাহিত, গুপ্ত-ব্যাপার জানিতে চাহিত। সে ঢুকিয়াছিল হয়ত নানা তথ্য বাহির করিতে। শেষে দেখিল ভীষণ ব্যাপার। তৎপরে শুনিয়াছি, তাহাকে ধরিবার সময় পুলিস তাহার সহিত অন্যান্য কয়েদীদের হইতে পৃথক ব্যবহার করিয়াছিল। এই জন্যই মনে হয়, বৈপ্লবিক গুপ্ত-ব্যাপার জানিবার জন্যই সে গুপ্ত-সমিতিতে ঢুকিয়াছিল। তবে পুরস্কারের কথা! সে কথা সাধারণে কি জানিবে! পরে শুনিয়াছি, আলীপুর জেলে যখন প্রকাশ পাইল যে গোস্বামী সরকারী সাক্ষী হইবে তখন তাহাকে অনেক বুঝান হইয়াছিল। তাহাতে সে উত্তর দেয় যে সে তাহা করিতে পারিবে না। আমার বোধ হয় তাহা ভাণ মাত্র। যে লোকটির এত উৎসাহ ছিল সে বিনা-নির্যাতনে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিল, এইরূপ দৃষ্টান্ত বৈপ্লবিক ইতিহাসে লিখে নাই, বাঙলাতেও না। যাহারা একরার করে, হয় তাহারা ভয়ে, না হয় নির্যাতনেই করে।”

[অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড]

সিভিলিয়ন বন্ধুর প্ররোচনাতেই হোক আর দণ্ড থেকে অব্যাহতিলাভ এবং বিলাতে রাজকীয়ভাবে থাকার আশ্বাসেই

হোক নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হবার জন্য রাজি হন। অন্যান্য আসামীরা যে তাঁর পুলিসের সঙ্গে সকল যোগাযোগের সকল খবর রাখেন, এ তার জানা ছিল না। তাই সকলের সঙ্গে মিলেমিশে আরো নতুন খবর জানার আশায় তিনি উদ্বুদ্ধ হন। ফলে, অনেকের একসঙ্গে থাকার আয়োজন করা হয়। সুযোগ বুঝে তিনি কারো কারো কাছে নানা প্রদেশের নেতাদের এবং গুপ্ত-সমিতির পৃষ্ঠ-পোষকদের এবং ভাবী কর্ম-কর্তাদের নামধাম বার করার চেষ্টা করেন। বিপ্লবীরা তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নানা কল্পিত নামধাম তাঁকে সরবরাহ করেন। গোঁসাইও নিঃসন্দেহে তা রাজগোচরে পরিবেশন করেন। সরকার পক্ষ ভারতময় তাদের বার করতে উঠে পড়ে লেগে যায়।

গোঁসাইর ওপর তরুণরা ভয়ানক ক্ষেপে যান। সুশীল সেন নাকি ইটের আঘাতে গলাটিপে মস্তক চূর্ণ করার প্রস্তাব করেন। কেউ নাকি একবার কি একটা ছলে তাঁকে পদাঘাতও করেন। অরবিন্দ বাবু তাতে জড়িয়ে পড়বেন বলে বারীনবাবু তাতে বাধা দেন।

"অনেক গবেষণার পর প্রথমে স্থির হয়েছিল, নরেনকে হত্যা করার ভার বাইরে যে কয়দল আমাদের বৈপ্লবিক বন্ধু ছিল তাদের ওপর দেওয়া হবে। আমাদের মধ্য থেকেও

বারীন ঐ ব্যবস্থাই করেছিল। চার, পাঁচ দল পৃথকভাবে চেষ্টা করলে যে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবে, সে আশা তখনও ছিল।……” [—বাঙ্গালায় বিপ্লব প্রচেষ্টা

“নরেনকে কেউ মেরে ফেলুক, অরবিন্দ বাবু, দেবব্রত বাবু প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া প্রায় অধিকাংশের মনে এই ইচ্ছা জেগেছিল। তখন বাংলাদেশে যে ক'টি বৈপ্লবিক গুপ্তদল ছিল, বারীনের প্রস্তাব অনুযায়ী তার প্রায় সকল দলের ওপর নরেনের হত্যার ভার দেওয়া হয়। তিন চারিটা দল প্রায় একই ধরণের উত্তর দিয়েছিল। তার মধ্যে মেদিনীপুরের দলও ছিল। তার মর্মটা ছিল—গোঁসাই হত্যার চাইতে তাদের হাতে বিস্তর গুরুতর কাজ রয়েছে। গোঁসাইর ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে অর্থাৎ তারা দল ভেঙ্গে দিয়ে দুর্গা-নাম জপ করছিল। বাকী যে দু' একটি দল কোন উত্তর দেয়নি, তারা চেষ্টা করলেও করতে পারে আশা ক'রে, কোথায় কি ভাবে চেষ্টা করবে, তার একটা লম্বা প্ল্যানও দেওয়া হয়েছিল।”

[—ঐ, পৃঃ ৩১৪

কিন্তু কোন প্ল্যান মতেই কাজ হয়নি বা হবার লক্ষণ দেখা যায় নি। কাজেই মেদিনীপুরের সত্যেন তার একটা ব্যবস্থা করতে বদ্ধপরিকর হন।

[দশ]

গোঁসাই-বধ পর্ব

"অসুর নিধনে কিসের তরাস ? পশুর নিধনে তোরা কি ডরাস ?
না গণি বিজন-কানন ভীষণ বিপদ্ বরিবি কে ?
নিষ্ঠুর অরি সংহার ক'রি, বীরের মতন মরিবি কে ?"

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর, সোমবার। এদিন সকালে দেশদ্রোহী গোঁসাইর অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসে। বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর-উমীচাঁদের বহুদিনকার পুঞ্জীভূত পাপরাশি আরো বাড়িয়ে তুলতে চান গোঁসাই। তাই অগ্নি-নালিকায় প্রাণ দিয়ে গোঁসাইকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

সোমবার প্রাতে সত্যেন্দ্রনাথ পুনরায় গোঁসাইকে ডেকে পাঠান। সকালে সাতটায় গোঁসাই হিগিন্‌স্ নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ কয়েদী প্রহরীকে নিয়ে হাসপাতালে যান।

হিগিন্‌সের সাক্ষ্যে প্রকাশ, সত্যেনের আহ্বানে অন্যান্য দিনের মত শনিবার দিনও একটা-দেড়টায় গোঁসাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। হিগিন্‌স একটু দূরে যেয়ে বসে। পরে গোঁসাইর কাছে সে শোনে সত্যেনবাবু রাজসাক্ষী হতে চান। লিণ্টন নামক অন্য একজন শ্বেতাঙ্গ কয়েদীও শরীর রক্ষীরূপে গোঁসাইর অনুসরণ করত। লিণ্টনের সম্মুখে হিগিন্‌স গোঁসাইকে খুব সতর্ক হতে বলে। সোমবার দিন যখন সত্যেন আবার

গোঁসাইকে ডেকে পাঠান তখন হিগিন্‌স তাঁকে বলে, "যেয়ো না, আমার মনে হচ্ছে লোকটার মতলব ভাল নয়। তোমার চেষ্টা বিফল হবে।" গোঁসাই বলে, "সত্যেন যা যা জানে লিখে দেবে বলে স্বীকার করেছে। তুমি আমার সঙ্গে গেলে সুখী হব।" হিগিন্‌স্ তাঁর অনুসরণ করে। এই শ্বেতাঙ্গ রক্ষকটি কয়েদী। জেলের নিয়মানুসারে সে জেলের ওভারশিয়রের কাজ কর্ম করে। নরেন গোঁসাই প্রাণের ভয়ে একা চলাফেরা করেন না, যখনই হাসপাতালে আসেন হিগিন্‌স্ লিণ্টন তাঁর শরীর-রক্ষী হিসাবে অনুসরণ করে।

সকালে হিগিন্‌সের সঙ্গে গোঁসাই যখন ডিসপেনসারীর দ্বারে দেখা দেন তখন সত্যেন্দ্রনাথ দোতালায় ডিস্পেনসারীর মধ্যে একটা বেঞ্চিতে বসে ছিলেন আর কানাইলাল দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন। গোঁসাইকে দেখেই কানাইলাল বারান্দায় চলে যান। গোঁসাই আসার আগেই সত্যেন্দ্রনাথ রিভলবারটি একটি দড়ি দিয়ে কোমরের সঙ্গে ভাল করে বেঁধে নেন, পাছে কেউ কেড়ে না নিতে পারে। গোঁসাই এসে তাঁর পাশেই আসন গ্রহণ করেন, হিগিন্‌স্ অন্য কুঠরীতে সরে যান যাতে তারা খোলাখুলি-ভাবে কথা বলতে পারে। কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা চলে।

এর মধ্যেই সত্যেন জামার পকেটে হাত রেখেই গোঁসাইর দিকে পিস্তলের গুলি ছুঁড়েন। গুলি নরেনের উরুদেশে বিদ্ধ

হয়। 'বাবারে, খুন কল্লেরে' বলে গোঁসাই প্রাণভয়ে ছুটে পালান। 'খট্' শব্দ শুনে হিগিন্স্ ছুটে এসেই সত্যেনকে ধরতে যায়। সে পিস্তল ধরে টানাটানি করে; কিন্তু কোমরের সঙ্গে বাধা থাকায় তা কেড়ে নিতে সক্ষম হয়নি। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পিস্তলের আওয়াজ হয়, হিগিন্সের মণিবন্ধে গুলি লাগায় হাতের মণিবন্ধ যায়, সে সত্যেনকে ছেড়ে দিয়ে অভিসম্পাত করতে করতে ভেঙে তাঁর আগেই বার হ'য়ে গোঁসাইর অনুসরণ করে। গোঁসাইর উদ্দেশ্যে ছুটে সত্যেন বার হয়ে যান।

সকলের আগেই গোঁসাই ডিস্পেনসারী থেকে ছুটে বার হয়ে যান। কানাইলাল পূর্ব-বন্দোবস্ত মত দোতলার উপর সিঁড়ির কাছে দাঁত মাজার ভাণ করে দাঁড়ানো ছিলেন। কি একটা কাজে কানাইলালকে অন্য একটা ঘরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকেই তিনি রিভলবারের আওয়াজ শোনেন। ত্বরিতগতিতে তিনি বারান্দায় ছুটে আসেন। এসেই বুঝেন নরেন পালিয়েছে। মনের উত্তেজনায় কানাইর শরীরে যেন একটা অদ্ভুত বল সঞ্চার হয়। বিপুল বিক্রমে তিনি গোঁসাইর উদ্দেশ্যে গেটের দিকে ছুটে যান। সত্যেন কোনদিনই বলিষ্ঠ নয়; হালে নানা অসুখে অস্থিচর্মসার হয়ে পড়েন। আজ ভয়ানক প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে তিনিও উন্মত্তবৎ সিঁড়ি বেয়ে নরেনের দিকে ধাবিত হন। তাঁর এই সংহার-মূর্তি দেখে হাসপাতালের সিনিয়র

এসিস্টাণ্ট বিজয় চট্টোপাধ্যায় থমকে দাঁড়ান। পিস্তলের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে তিনি অগ্রসর হন কিন্তু অগ্নি-নলিকার সম্মুখে এগোতে ভরসা পান না।

নরেন গোঁসাই ছ'ডিগ্রিতে একত্র থাকার সময়েই কিছুটা বুঝে আসেন, সবাই তাঁকে কি পরিমাণ ঘৃণা করেন। তাঁর ন্যায় মীরজাফর উমিচাঁদের তার চাইতে কি-ইবা বেশী প্রাপ্য। রাজ-সাক্ষী হবার পর তাঁর প্রতি পদে কত বিপদ তাও তিনি বুঝতে পারেন। দণ্ড মকুব হবার ও বিলাতে রাজহালে থাকার প্রলোভনে তিনি হিগিন্‌সের সতর্ক বাণী উপেক্ষা করে কত বড় নিবুদ্ধির কাজ করেছেন তা টের পান বটে কিন্তু তখন আর উপায় নেই। তখন তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে প্রাণ-বাঁচানোর জন্য, সত্যেন-কানাইর হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় হাসপাতালের গেটের দিকে দৌড়ান। গোঁসাই গেট পার হয়ে তীরবেগে ছুটে চলেন আর তাঁর পিছনে চলেন কালান্তক যমের ন্যায় কানাই। নরেনের শরীর বেয়ে ফিনকি দিয়ে শোণিত-ধারা নির্গত হয় তবু প্রাণ ভয়ে ছুটে চলেন।

এদিকে সত্যেন ডিস্পেনসারী থেকে বার হয়ে পিস্তল উঁচিয়ে একজন কয়েদীকে জিগ্যেস করেন, নরেন কোন্ দিকে গেল। সে নির্বাকভাবে আঙুল দিয়ে ইসারা করে পথ দেখিয়ে দেয়। সত্যেন সম্মুখের দিকে ছুটে যান। কানাইলাল তাঁর আগেই

নরেনের নিকটবর্তী হয়ে গুলি চালাতে থাকেন। সত্যেনও এগিয়ে গুলি চালাতে থাকেন। তাঁর এক গুলির আঘাতে কানাইলালের গায়ের চামড়া ছড়ে যায়। আগে হিগিন্‌স্‌ ও তার পিছনে নরেন তাঁতের কলের নিকটবর্তী রাস্তা ধরে ছুটে চলে। পশ্চাতে সত্যেন ও কানাই গুলি-ভরা পিস্তল নিয়ে তাদের তাড়া করছেন।

এই সময়ে জেলের ডাক্তার এগিয়ে এসে একজন কয়েদীর সাহায্যে নরেনকে ধরে জেল-আফিসের দিকে নিয়ে চলেন। অপরদিক থেকে লিণ্টন নামক নরেনের জনৈক শরীররক্ষী শ্বেতাঙ্গ কয়েদী ও জেলার প্রভৃতি জেল আফিসের দিক থেকে নরেনকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন।

তাঁতের কলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়। তখন নরেন ও হিগিন্‌স্‌ রক্তপাতে অবসন্ন হয়ে পড়ে। ডাক্তার ও একজন কয়েদীর সাহায্যে নরেন যখন দু'এক পা করে অগ্রসর হচ্ছিল তখন সত্যেন ও কানাই পিস্তল উঁচিয়ে নরেনের ঠিক পশ্চাতে এসে পৌঁছান। লিণ্টন ও জেলের অধ্যক্ষকে এগোতে দেখে তাঁরা তাদের দিকেও পিস্তল উঁচু করে ধরেন। প্রাণ ভয়ে তারা এক পাশে সরে পড়েন। শোনা যায় জেলার তাঁত-ঘরের একখানা ভাঙা বেঞ্চির নীচে আশ্রয় নেন। এই সময়ে লিণ্টন হঠাৎ অগ্রসর হয়ে পশ্চাৎ দিক থেকে

সত্যেন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ লিণ্টনকে ঠেলে ফেলে তার হাত ছাড়িয়ে চলে আসেন। লিণ্টনের কানের কাছ দিয়ে ভোঁ করে একটি গুলি চলে যায়। লিণ্টন মাথা উঁচু করে দেখে নরেন গুলি খেয়ে ঘুরে পড়ছে। এই গুলি খেয়ে নরেন্দ্র সেখানে স্নানাগারের নিকটে নর্দমায় মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান।

লিণ্টন একবার কানাইলালকে ধরতে যায়। কানাইলালের পিস্তলের আঘাতে লিণ্টনের কপালের চামড়া ছড়ে যায়। লিণ্টন কিছুতেই কানাইকে ধরতে পারে না। ইতিমধ্যে কানাইলাল ড্রেনে পতিত নরেনকে আর এক গুলিতে বিদ্ধ করেন।

সত্যেন ও কানাই শেষ গুলিটা পর্যন্ত নরেনের ওপর বর্ষণ করেন। সর্বসমেত তাঁরা নয়টি গুলী করেন, তার মধ্যে ৪টি নরেনের শরীরে বিদ্ধ হয়।

তারপর জেলের পাগলা-ঘন্টি (Alarm Bell), ভোম্বা (whistle) রণিয়ে উঠে। সশস্ত্র পুলিস সৈন্যের আবির্ভাব হয়—একে একে জেলখানার যথাযোগ্য কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

[এগার]

সেসন্সে সত্যেন ও কানাইলালের বিচার *

"ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।

—রবীন্দ্রনাথ

১৫ই অক্টোবর সরকারী উকীল আশুবাবু আলীপুরের সেস্‌নসে জজ মিঃ রো'র নিকট এই আবেদন করেন যে সেসন্সে এই মোকদ্দমা আলীপুরের অতিরিক্ত জজ মিং বিচ্‌ক্রফ্‌টের নিকট উঠ্‌বার কথা কিন্তু তিনি শীগগীর এই মোকদ্দমার বিচার করতে পারবেন না। এদিকে মামলা সত্বর শেষ করা প্রয়োজন। অতএব মিঃ রো স্বয়ং এই মোকদ্দমার বিচার করুন এবং সোমবার থেকে মোকদ্দমা আরম্ভ করুন।

সত্যেন্দ্রনাথের উকিল এতে আপত্তি করেন, বলেন, আমরা প্রস্তুত হবার সময় পাবনা। জজ হুকুম দেন, শুক্রবার দুপুরের মধ্যে আসামী পক্ষ কাগজপত্রের নকল পাবেন।

* 'বিপ্লবী কানাইলাল' থেকে উদ্ধৃত

সোমবার আলীপুরের সেসন জজ মিঃ এফ্ আর রো'র এজলাসে নরেন গোঁসাইকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করা এবং লিণ্টন ও হিগিন্স্কে হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্তের বিচার আরম্ভ হয়। এইদিন আদালত-গৃহে খুব কড়া-পাহারা বসে। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হলটিন ও ইন্সপেক্টর হিউই ন'জন শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট ও জন কয়েক কনস্টেবল আদালত-গৃহ ও আদালতের নিকটবর্তী স্থান অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পাহারা দেয়।

প্রথমেই পৌঁছায় জুরীরা। জুরীদের কেউ কেউ জানান যে কেবল একদিন পূর্বে তাঁরা তাঁদের সমন পান। জজ সাহেব সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের বসার বন্দোবস্ত করে দেন।

ঠিকা গাড়ি করে আসামীদের জেল থেকে আনা হয়। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হলটিন একজনের সঙ্গে ও ইনস্পেক্টর কবেল অপর আসামীর সঙ্গে ছিলেন। কয়েদির গাড়ি করে সাক্ষী-দের আনা হয়।

পিস্তলের গুলি হিগিন্সের হাতের মণিবন্ধ ভেদ করে যায়। রক্তপাত ও যন্ত্রণায় সে দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ায় সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হতে পারে নি।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর উকীল বাবু নরেন্দ্রনাথ বসুর কাছে বলেন, জেলের কয়েদীর পোশাক না পরে সাধারণ পোশাকে

তিনি কোর্টে আসতে চান। বলাবাহুল্য, তাঁর এই প্রার্থনা মঞ্জুর হয়নি।

জজ আসন গ্রহণ করলে সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালকে কয়েদীর পোশাকে আদালতে হাজির করা হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের উকীল বাবু নরেন্দ্রনাথ বসু তাঁর মক্কেলের সঙ্গে পরামর্শ করার অনুমতি চান। জজ অনুমতি দেন। এদিকে আশুবাবু নিবেদন জানান, আসামীদের বিরুদ্ধে অন্য একটা অভিযোগ স্থাপন করা হোক। নরেনবাবু এই মর্মে এক দরখাস্ত দাখিল করেন যে এই আদালত আইনমতে এই মোকদ্দমার বিচার করতে পারেন না। আশুবাবু এই দরখাস্তের প্রতিবাদ করেন। জজ সাহেব ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন।

অতঃপর আসামীদের তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনান হয়।

জজ সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে কানাইলাল দত্ত বলেন, 'আমার যা বলার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই বলেছি। আমি আর কিছু বলতে চাইনে। আমি আত্ম-সমর্থনের জন্য কিছু বলতে চাইনে। আমার কোন উকীল নেই।

জজ—তুমি কি ইচ্ছা কর যে আদালত তোমার পক্ষ-সমর্থনের জন্য কোন উকীল নিযুক্ত করে?

কানাই—না।

জজ—জুরী নির্বাচনে তুমি আপত্তি করতে পার।

সত্যেন্দ্র বা কানাইলাল কোন উত্তর দেন না।

সত্যেন্দ্রনাথ বলেন, আমি দোষী নহি।

(১) মিঃ জে, এন স্লি (২) এইচ্ নিকোল্‌স (৩) আশুতোষ দত্ত (৪) বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ (৫) শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়—জুরী ।চিত হন।

মোকদ্দমার উদ্বোধন করে আশু বাবু বলেন, এদের যে-কেউ গুলি করেছে। এক্ষণে এরা উভয়ে একযোগে ষড়যন্ত্র করেছে বলে যদি সপ্রমাণ হয় তা হলে উভয়েই অপরাধী সাব্যস্ত হয়। রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে অন্যত্র আসামীদের বিচার চলছে।

উকীল নরেন্দ্র বাবু একথায় আপত্তি করেন। জজ এই আপত্তি গ্রাহ্য করেন না। নরেনবাবু বলেন, সত্যেন্দ্রনাথ যে গোঁসাইকে ডেকে আনে তার কোন প্রমাণ নেই।

সরকারী উকীল বলেন, এই সম্বন্ধে আমরা আরও প্রমাণ উপস্থাপিত করব।

এর পর সাক্ষীদের ডাক পড়ে। শ্যামাচরণ খান্না ঘটনাস্থলের নক্সা সম্বন্ধে ও মিঃ বার্লি প্রথম দলের আসামীদের

বিরুদ্ধে যে মামলা চলছে সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন। প্রথম দলের বিরুদ্ধে গোঁসাই যে সাক্ষ্য দিয়েছে আশুবাবু তা দাখিল করতে চাহেন। এই সময়ে মিঃ এ, সি, বানার্জী আসামীপক্ষ সমর্থন করার জন্য উপস্থিত হন। তিনি আশুবাবুর কথার প্রতিবাদ করেন। জজ এই প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেন।

ইনস্পেক্টর বিনোদ গুপ্ত গোঁসাইর সরকারী সাক্ষী হবার বিষয় সাক্ষ্য দেন। আশুবাবু কতকগুলি প্রশ্ন করতে উদ্যত হন। জজসাহেব বলেন, আসামীদের দায়রায় দেবার সময়ে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ নথিভুক্ত করা হয়েছে আপনি তার অতিরিক্ত কোন কথা উত্থাপন করতে পারবেন না। তিন দিন মধ্যে মোকদ্দমা শেষ করার জন্য আপনি জেয়া করছিলেন, এক্ষণে নতুন কথা তুলতে পারবেন না।

আশু বাবু বলেন ভুল হয়ে গেছে।

জজ বলেন, কার ভুল?

আশুবাবু—আমি জানিনে।

মিঃ বানার্জী ইনস্পেক্টার গুপ্তকে বহু জেরা করেন। উত্তরে তিনি বলেন, অনেক খুঁজেও তিনি তৃতীয় পিস্তলটির। সন্ধান পাননি।

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বেল সাক্ষ্যে বলেন, পোস্ট মর্টমে নরেনের শরীরে ঐ সব গুলি পাওয়া যায়।

জজ কানাইকে বলেন, তুমি ইচ্ছে করলে সাক্ষীকে প্রশ্ন করতে পার।

কানাইলাল উত্তর দেন, প্রশ্ন করার নেই কিছু।

গোপাল মাইতি নামক জেলের একজন মেটের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। সে বলে, ঘটনার দিন প্রাতে ৭টার সময় বোমার আওয়াজের মত একটা শব্দ শুনে আমি বার হয়ে আসি। ডিস্পেনসারীতে এই দু'জন বাবু যুঝা-যুঝি করছিলেন।

সাক্ষী কানাই ও সত্যেনকে দেখিয়ে দেন।

আশুবাবু জজকে বলেন, এই সাক্ষী বিরুদ্ধবাদী হয়েছে। আসামীর বারিস্টার এই কথায় আপত্তি করেন। সাক্ষীকে মিঃ বানার্জী জেরা করেন। জেরায় সাক্ষী বলে, আমি যখন আসামীদের প্রথমে দেখি তখন তাঁদের কারো হাতে পিস্তল ছিল না। আসামীরা তখন বারান্দায় ছিলেন। ডাকাতি ও খুনের মামলায় জড়িত হওয়ায় আমার ১০ বৎসর জেল হয়। জেলে সৎব্যবহারের জন্য আমি এখন জেলের কাজকর্মের তদারকের কাজ পেয়েছি। সত্যেনবাবুকে বারান্দায় বেড়াতে দেখি, পরে আর দেখিনি। কানাই বাবু যখন জিগ্যেস করেন যে গোঁসাই কোথায় তখন গোসাই তাঁর কাছে ছিলনা। গোঁসাইকে যখন দেখি, তখন তার মুখে কোন দাগ দেখিনি। হিগিন্‌স্ তার নিজের হাত ধরে কাঁদতে কাদতে অভিসম্পাত

করে বার হয়ে আসে। তখন কোন অস্বাভাবিক গন্ধ পাই।

এরপর ডাক্তার ডেয়লি সাক্ষ্য দেন। মিঃ বানার্জির জেরায় তিনি বলেন, বড় পিস্তলের গুলিতেই নরেনের শীরের ঐ সব ঘা হতে পারে। ক্যানাইর শরীরে যে ক্ষত দেখেছি তা গুলির ঘা বা অন্য-কিছুতেও হতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথ যদি যুঝাযুঝি করে থাকে তবে তার শরীরে চিহ্ন থাকাই সম্ভব।

মঙ্গলবার প্রথমে হিগিন্সের সাক্ষ্য লওয়া হয়। হিগিন্স পূর্বের মতই সাক্ষ্য দেয়। জেরায় সে বলে, সত্যেন্দ্র, যতদূর মনে হয়, আমি যখন যুঝাযুঝি করছিলাম তখন গুলি করেনি। সে কেবল গোঁসাইর দিকে পিস্তল তাক করে। নরেন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের অনুমতি নিয়ে ৫।৬ বার জেলে সত্যেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। লাথির চোটে আমি পড়ে গেলে গোঁসাইর উপর গুলি করা হয়, কে গুলি করে দেখিনি। বারান্দা থেকে মাত্র একটি গুলি করা হয়।

অনুরূপ দাস নামক জনৈক কয়েদী সাক্ষ্যে বলে, ঘটনার দিন আমি সত্যেন্দ্রনাথকে বারান্দায় দেখি। তিনি আমাকে বলেন গোঁসাইকে পাঠিয়ে দিও। জেরায় সে বলে, সত্যেন্দ্রকে কানাইর সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কখনো মিশতে দেখিনি।

মার্টন কোম্পানীর মিঃ ব্রাউন পিস্তলের গুলি সম্পর্কে

সাক্ষ্য দেন। ইনি বলেন, বোধ হয় মোট ৩টি গুলি করা হয়।

অমূল্য নামক জনৈক কয়েদী বলে, আমি ডিস্পেনসারীতে কাজ করি। আমি গোঁসাইবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুকে যুঝাযুঝি করতে দেখেছি। কানাইবাবুর হাতে একটা পিস্তল ছিল, সত্যেনবাবুর হাতে কোন অস্ত্র ছিলনা। গোঁসাইবাবু ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করেন আর এঁরা চান বার করে দিতে। কানাইবাবু কাপড়ের নীচ থেকে পিস্তল বার করে গোঁসাইকে গুলি করেন। ডাক্তার বাবু আস্‌লে কানাইবাবু পিস্তল বার করে ভয় দেখান। জেরায় মিঃ ব্যানার্জী দেখান, নিম্ন আদালতে সাক্ষী বলে, কানাই ডাক্তারবাবুকে ভয় দেখায়! সাক্ষীর কথায় সকলে কানাইকে ধরে কিন্তু সত্যেন্দ্রকে ধরেনি। কেন ধরেনি তা সে বলতেও পারেনি।

তারপর বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক কয়েদী সাক্ষ্য দেয়। সে বলে, সত্যেন্দ্রর হাতে সে পিস্তল দেখেনি কিংবা সত্যেন্দ্রকে কিছু করতে দেখেনি।

ডাক্তার বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, সত্যেন্দ্রের হাতে যে পিস্তলটি ছিল কানাইর হাতে তার চাইতে বড় একটি পিস্তল ছিল। জেরায় তিনি বলেন, মিঃ মারের নিকট সাক্ষ্য দেবার সময় সত্যেন্দ্রের হাতে বন্দুকের কথা তিনি বলেননি।

৩১শে আগস্টের পূর্বে সত্যেন্দ্রকে নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে দেখেন নি। সত্যেন্দ্র যখন লিণ্টনের সঙ্গে যুঝে—কেবল সেই সময়ে সাক্ষী তার হাতে পিস্তল দেখে।

কারাধ্যক্ষ বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ সাক্ষ্যে বলেন, তিনি কানাইকে গোঁসাইর উপর গুলি চালাতে দেখেছেন। সত্যেন্দ্রের হাতে একটা পিস্তল ছিল বলে শুনেছিলেন কিন্তু দেখেন নি।

জজ—কানাই, তুমি কিছু জিগ্যেস করবে?

কানাই—না।

বুধবারও মোকদ্দমা চলে।

সেদিনও কয়েকজন সাক্ষী ডাকা হয়। আসামীদের পক্ষে নরেন্দ্রনাথ বসু ও বারিস্টার মিঃ এ. সি, বানার্জী খুব দক্ষতার সঙ্গে সাক্ষীদের জেরা করেন। মিঃ বানার্জী জুরীদের নিকট মোকদ্দমার অবস্থা সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

জজ কানাইকে জিগ্যেস করেন, তুমি কিছু বলতে চাও?

কানাই উত্তর দেন—না।

জজ—তুমি পূর্বের কোন কথা প্রত্যাহার করতে চাও কি?

কানাই—হাঁ। আমি যে সেদিন বলেছিলাম, 'আমি ও

সত্যেন্দ্রনাথ এই খুনের জন্য দায়ী'—কেবল সেই কথাটি প্রত্যাহার করতে চাই। আর বলতে চাই, 'একা আমিই এই খুন করেছি, আর কেউ আমাকে সাহায্য করেনি।'

কানাইলালের এই উত্তর শুনে আদালত-গৃহের অনেকের নয়নে অশ্রু দেখা দেয়। স্বয়ং জজও বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়েন, কিছুক্ষণের জন্য তাঁরও লেখনী স্তব্ধ হয়ে যায়। আদালতের সকলের মনের উপর দিয়ে একটা বিহ্বল ভাব-প্রবাহ বয়ে যায়।

এই তো আদর্শ বিপ্লবী! কানাইলাল যখন দেখলেন সরকারের আইনের ফাঁকে সত্যেনের প্রাণ-রক্ষার সম্ভাবনা আছে, অথচ তাঁর নিজের বাঁচবার কোন সূত্রই নেই, একমাত্র তাঁর স্বীকারোক্তি ছাড়া সত্যেনের বিরুদ্ধে প্রবল সাক্ষ্য-প্রমাণের নিতান্ত অভাব তখন তিনি তাঁর পূর্বের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেন--সমস্ত অপরাধ, সমস্ত দায়িত্ব নিজের ওপর গ্রহণ করেন। সহকর্মীকে রক্ষার কি আকুল বাসনা!

জজ ও জুরীরা কানাইলালকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। কানাইলাল দত্তের ফাঁসীর হুকুম হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে দু'জন শ্বেতাঙ্গ জুরী দোষী ও তিন জন দেশী জুরী নির্দোষ বলেন।

জজ হাইকোর্টে বিচারার্থ মোকদ্দমা পাঠিয়ে দেন।

*　　*　　*　　*

২১শে অক্টোবর, বুধবার জাস্টিস সফরুদ্দীন ও কক্সের এজলাসে সত্যেনের মোকদ্দমার শুনানী হয়। তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসীর হুকুম দেন।

জাস্টিস সফরুদ্দীন মোকদ্দমার সময় যে-সকল উক্তি করেন তাতে কেউই মনে করতে পারেন নি যে তিনি সত্যেনের ফাঁসীর পক্ষ সমর্থন করবেন। ব্যারিস্টার পি, এল, রায় সত্যেনের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে অনেক সুযুক্তির অবতারণা করেন।

তাঁর সব চেষ্টাই নিস্ফল হয়।

আলীপুরের ৫ জন জুরীর তিন জন সত্যেনকে নির্দোষ বলে নির্ধারণ করে। তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ প্রমাণ দাঁড় করতে না পারলেও তাঁর প্রতি ফাঁসীর হুকুম হয়। এই হুকুমে দেশকে দেশ, বিশেষ করে, কলিকাতার লোক স্তম্ভিত হয়ে যায়।

জজেরা কানাইলালের ফাঁসীর হুকুমও বহাল করেন।

[বার]

ফাঁসীর আগে

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নইলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে,
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ যাক্ প্রাণ—মা আমার, মা আমার।

—কামিনী রায়

লাট সাহেব প্রাণদণ্ড রহিত না করাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু ১৫ হাজারের কম টাকায় আপীল হবে না তা শুনে পরের শুক্রবার লর্ড মর্লির নিকট দণ্ড-রহিতের জন্য টেলিগ্রাম করা হয়। লর্ড মর্লি সেইদিনই তারযোগে জানান যে তিনি এতে হস্তক্ষেপ করবেন না। সম্রাট এডওয়ার্ডের নিকটও জরুরী টেলিগ্রাম করা হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তার-বিভাগকে তা রাজার নিকট পাঠাতে নিষেধ করেন। সত্যেনের কোন আত্মীয় তাঁর প্রাণ-রক্ষার জন্য যতপ্রকার চেষ্টা সম্ভব তার কিছুমাত্র ত্রুটি রাখেন নাই; কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হয়।

আপীল না-মঞ্জুর হলে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সহোদর জ্ঞান-বাবুর নিকট একখানা এবং ভগ্নী সুরবালা দেবীর নিকট একখানা পত্র দেন।

সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি দুখানি পড়ে মনে হয়, তিনি তাতে তাঁর মার জন্যই কেবল একটু চাঞ্চল্য ভাব দেখিয়ে ছিলেন, নচেৎ মৃত্যু আসন্ন; জেনেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

* * *

প্রাণদণ্ডের দিন নির্দিষ্ট হবার পর সত্যেন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন তাঁদের সকলের কথা বাহুল্য ভয়ে দিলাম না, কেবল তাঁর ভগ্নির সঙ্গে যে সকল কথা হয়েছিল তার কতক, যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা নিম্নে প্রদত্ত হল।

তাঁর ভগিনী সুরবালা দেবী সাক্ষাৎ করতে গেলে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর মাতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "সুবোধ (ছোট ভাই) স্বেচ্ছায় আমেরিকায় গিয়েছে—তাঁর (মাতার) ধন তাঁরই আছে কিন্তু চর্মচক্ষে তিনি আর তাকে দেখতে পাচ্ছেন না সেইরূপ আমিও অত্যন্ত ইচ্ছা ও আগ্রহের সঙ্গে নিশ্চিন্ত ও নির্ভীক হৃদয়ে অন্য এক ধামে

যাচ্ছি। আমি সেখানেও তাঁরই থাকব, কেবল আমার দেহ থাকবে না। অতএব তিনি যেন আমার জন্য খেদ না করেন। তাঁকে ভেবে দেখতে বলো, অমর আত্মাকে বিনাশ করবার কারও সাধ্য নেই।

তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ জানান। শাস্ত্রী মহাশয় যখন কারাগারে প্রবেশ করেন, সত্যেন্দ্রের মুখে আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠে। মাত্র ১০ মিনিট সময় দেওয়া হয়। শাস্ত্রী মহাশয় প্রহরী-বেষ্টিত হয়ে লৌহদণ্ডের বেড়ার বাইরে দণ্ডায়মান হন। বেড়ার ভিতর থেকে সত্যেন জিগ্যেস করেন, 'আপনি বলুন কিরূপে শান্তিতে মরতে হয়?' শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, 'তোমার স্বর্গীয় পিতা ও পিতৃব্যকে স্মরণ কর। তাঁরা উভয়েই ধার্মিক ছিলেন। তুমি তাঁদেরই কাছে যাচ্ছ। পৃথিবীর ভাবনা পরিত্যাগ কর। তুমি ত জানই যে একদিন না একদিন পৃথিবী ত্যাগ করে যেতে হবে। অতএব প্রস্তুত হওয়া তোমার পক্ষে কষ্টকর নহে। আবেদনের উপর অধিক নির্ভর করো না। নিশ্চিত হও যে তোমাকে প্রাণদান করতেই হবে। তোমার খ্যাতনামা পিতৃব্য ৺রাজনারায়ণ বসুকে স্মরণ করে ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন কর। তাঁর নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা কর ও তাঁকে চিন্তা করতে করতে দৃঢ়চিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর।

শাস্ত্রী মহাশয় তখন যে প্রার্থনা করেন সত্যেন্দ্রনাথও সেই প্রার্থনা করেন।

"হে ভগবান, আমাকে শান্তিতে প্রাণত্যাগ করতে শিক্ষা দাও। আমাকে বল দাও। হে সর্বশক্তিমান পরম পিতা, আমি তোমার নিকট যাবার জন্য পিপাসার্ত হয়েছি।" সত্যেন্দ্রনাথ তখন লৌহের বেড়ার উপর মস্তক রক্ষা করেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর মনোগত ভাব বুঝে তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বলেন, "আমি নিশ্চয় জানি ভগবান তোমাকে ক্ষমা করবেন।"

তিনি সার্জেন্টদের বলেন, 'সত্যেন সাধারণ দুষ্কর্মকারীদের মত নয়।' ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করবার অব্যবহিত পূর্বে তাঁর মনে ভগবানকে জানবার অসাধারণ ইচ্ছা হয়। তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ সকলেই ধার্মিক লোক ছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে কারাগার থেকে আসবার সময় তিনি সত্যেন্দ্রকে অধিকতর নিশ্চিন্ত দেখে এসেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ভগবানকে ভাল করে জানার জন্য ও শান্তিতে প্রাণত্যাগ করার চিন্তায় এতই নিবিষ্ট ছিলেন যে অন্য বিশেষ-কিছু বলতে পারেন নি।

[তের]

ফাঁসির মঞ্চে সত্যেন্দ্রনাথ

"মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এজীবন কেবা ধরে?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক ভার
থাক্ প্রাণ যাক্—মা আমার, মা আমার।

—কামিনী রায়

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের দিনপঞ্জীতে ১৯০৮ সালের ২১শে নভেম্বর (৬ই অগ্রহায়ণ) শনিবার রক্তাক্ষরে লেখা থাকবে। বাঙলার তথা ভারতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এদিন কক্ষচ্যুত হয়। স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী তরুণ বাঙালীদের আদর্শ বিপ্লবী সত্যেন্দ্র-নাথ বসু বাঙলার কলঙ্ক দেশ-দ্রোহী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার অভিযোগে এই শুভদিনে ফাঁসির মঞ্চে স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দেন। একদা মীরজাফর উমীচাঁদের ঘৃণিত ষড়যন্ত্র সোনার বাঙলাকে ইংরেজের হাতে তুলে দেয়, তাদের সমতুল্য দেশদ্রোহী নরেন গোঁসাই চায় স্বদেশের মুক্তি জলাঞ্জলি দিয়ে আরো কতকগুলো ছেলেকে ধরিয়ে দিতে, জেল-ফাঁসি--যাই তাদের হোক—তার বদলে সে চেয়েছিল নিজের মুক্তি, রাজহালে বিলাতে বসবাস করার বাসনা।

সত্যেন্দ্রনাথ বিপ্লবীসুলভ যশ-খ্যাতি মান-মর্যাদা বিপন্ন করে রাজসাক্ষীর ভাণ করেন এবং সেই স্বদেশ-দ্রোহীর সমুচিত শাস্তি দেন। তার বদলে তাঁকে শহীদের প্রাপ্য ফাঁসির রজ্জু বরণ করে নিতে হয়।

১৯০২ সালে সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশ-মুক্তির কঠোর ব্রত গ্রহণ করেন, সে ব্রত তার উদ্‌যাপন হয় ফাঁসির মঞ্চে।

সত্যেনের সহকারী হিসাবে কানাইলাল অতুলনীয় সাহস দেখান। এই দু'জনের অপূর্ব ত্যাগের জন্যই বিশ্বাস-ঘাতক গোঁসাই সমুচিত ফল পান। কানাইলাল ১০ই নভেম্বর ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দান করেন। তাঁর শবদেহ নিয়ে কলকাতায় যে সমারোহ হয় তাতে ফিরিঙ্গিদের সব ক'টা কাগজ, মায় বিলাতের সংবাদপত্রগুলো ক্ষেপে উঠে। তারা সত্যেনের শবদেহ সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব করে তার মর্ম এই :—

সত্যেনের দেহ তাঁর আত্মীয় স্বজনের হাতে না দিয়ে জেলের মধ্যে গোর দেওয়া উচিত।

ভারতের সহকারী সচিব মিঃ বুকানন পার্লামেণ্টে বলেন, যদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সমারোহের সম্ভাবনা থাকে তবে ফাঁসি-দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির দেহ ভবিষ্যতে তাঁর আত্মীয়দের হাতে দেওয়া হবে না।

প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে জেল-

সংক্রান্ত আইনে এই বিধি ছিল যে, তাঁর আত্মীয়-স্বজন যদি দেহ নিয়ে যেতে না চান, তবে তাঁর দেহ তাঁর জাতীয় পদ্ধতি অনুসারে দাহ বা সমাধিস্থ করা হবে।

উপরোক্ত নিয়মের পরিবর্তে গবর্ণমেণ্ট তখন নিয়ম করেন, ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির দেহ তার আত্মীয়দের দেওয়া হবে, অথবা যতদূর সম্ভব তার জাতীয় আচার-পদ্ধতি অনুসারেই দাহ বা সমাধিস্থ করা হবে। কিন্তু সুপারিনটেণ্ডেণ্ট যদি সন্দেহ করেন যে শবদেহ নিয়ে খুব সমারোহের সম্ভাবনা আছে, তবে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির দেহ তাঁর আত্মীয়দের হাতে দেওয়া হবে না।

সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকজন আত্মীয় তাঁর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করার জন্য আবেদন করেন। আলীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এই আদেশ দেন যে জেলখানার সীমার মধ্যে কোন স্থানে তাঁর দেহ চিতানলে ভস্মীভূত করতে হবে। নিম্নলিখিত সর্তে তাঁদের রাজী হতে হয়।

১। জেলের বাইরে দাহ করা যাবে না।

২। কোনপ্রকার আড়ম্বর ও আন্দোলন করা যাবে না।

৩। কোন স্মারক-চিহ্ন নেওয়া যাবে না।

৪। জেলের মধ্যে কর্তৃপক্ষের সম্মুখে দাহ-কার্য সম্পন্ন করতে হবে।

৫। ১৪।:৫ জনের অধিক লোক আসতে পারবে না।

শনিবার ছ'টার কিছু পূর্বে জেলার প্রভৃতি সত্যেনের কারা-কক্ষের সম্মুখে গিয়ে দেখেন তিনি বসে রয়েছেন। জেলারকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ান। জেলারের আদেশে কক্ষের দ্বার খুলে ফেলা হয়। একটু হেসে সত্যেন্দ্রনাথ কক্ষ থেকে বার হয়ে আসেন।

জেলারের নির্দেশে তাঁর হাত দুটি পেছন দিকে লৌহশৃঙ্খলা-বদ্ধ করা হয় এবং বাহুতেও রজ্জু বদ্ধ করে তাঁকে বধ্য মঞ্চের কাছে নেওয়া হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁকে ফাঁসির দণ্ড পড়ে শুনিয়ে জিগ্যেস করেন, তাঁর কিছু বক্তব্য আছে কিনা। তিনি কিছু বলতে অসম্মত হন।

জনৈক প্রহরী তাঁকে বধ্যমঞ্চে নিয়ে তুলেন। জহ্লাদ তাঁর পদদ্বয় রজ্জু দ্বারা বেঁধে ফেলে চোখ ঢেকে দেয়।

সত্যেনের মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে ওঠে, সে হাসির সুমুখে কারো তিষ্ঠান কঠিন হয়ে ওঠে—সবাই চোখ ফিরিয়ে নেয়। জহ্লাদ তার গলায় ফাঁসি পরিয়ে দেয়।

পদতল থেকে মঞ্চ অপসারিত করা হল। তারপর বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথের শবদেহ অতল গহ্বর গ্রাস করে বটে কিন্তু তাঁর

ছড়ান বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত করতে পারে না, বরং তা দ্বিগুণিত হয়ে সমগ্র ভারতময় ছড়িয়ে পড়ে।

কিছুকাল পর দশ জন আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের হাতে তাঁর শবদেহ দেওয়া হয়। জেল-খান্নার মধ্যেই তাঁরা চিতা প্রস্তুত করে দেহ ভস্মীভূত করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সব সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কাউকে চিতাভস্ম পর্যন্ত নিতে দেননি।

বাইরে কোথাও তাঁর শবদেহ না পাওয়ায় তাঁর কুশমূর্তি প্রস্তুত করে শশ্মানে তা দাহ করার আয়োজন করে।

আলীপুরে ও কলিকাতার ম্যাজিস্ট্রেট পরোয়ানা জারী করেন, যারা সত্যেনের কুশমূর্তি নিয়ে রাস্তায় বার হবে তাদের ১৪৪ ধারামতে গ্রেপ্তার করা হবে।

[তের]

আদর্শ-বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ

"কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ;
কাতরে কাঁদিবে মায়ের পায়ে দিবে,
সকল প্রাণের কামনা।"

—রবীন্দ্রনাথ।

মনে হয় গোঁসাই-হত্যায় সত্যেন্দ্রনাথের একটু বিশেষত্ব আছে। শুনতে পাই, বৈপ্লবিক নীতিতে বলে, কোন অতি বড় বিশ্বাসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দৃঢ়চিত্ত কর্মী দিয়ে কোন বৈপ্লবিক হত্যা সংঘটন করাতে হলে ঐ সংঘটনের অল্পসময় পূর্বে তাঁর ওপর এই দুঃসাহসিক কাজের ভার দিতে হয়। নচেৎ, বেশি সময় দেওয়া হলে, যে প্রাণের মায়া জীব-জগতের সব প্রবৃত্তি অপেক্ষা প্রবল—বিশেষ করে, পরাধীন দেশে, সেই মায়া কোন-না-কোন প্রকারে—সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ছদ্মবেশে মনের মধ্যে জেগে ওঠে, ঐ দুঃসাহসিক কাজ করবার উদ্যমকে দমিয়ে দেয়, বা একটা-না-একটা ওজর খুঁজে নেয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ

ষড়যন্ত্র-সময়ের সমস্তটি—প্রায় দু'মাস পূর্ব থেকে মতলব এঁটে স্থির, ধীরভাবে সম্পন্ন করেন।

প্রথমে হয়ত উত্তেজনার বশে এই হত্যার কল্পনা তাঁর মনে দৃঢ়ভাবে জেগে উঠে। এত সময়ের মধ্যে তাঁর সে দৃঢ়তার বদলে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত মায়া জেগে উঠতে পারত, তখন ঐ ব্যাপার থেকে নিবৃত্ত হলেও কারো কাছে তাঁকে জবাবদিহি হতে হতো না, বা লোকনিন্দার ভয়ও ছিলনা। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ জীব-স্বভাব-সুলভ অতি বড় প্রবৃত্তিকে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গোঁসাই-বধ-পর্বে সত্যেন্দ্রনাথের মত একনিষ্ঠ দেশসেবকের পক্ষে 'রাজ-সাক্ষীর' অভিনয় যে কতদূর মারাত্মক তা'র গুরুত্ব সত্যেনের মোটেই না-জানার, না-বুঝার কথা নয়। এই ব্যাপার যদি অঙ্কুরেই বিনাশ হত, কিংবা শেষ-পর্যন্ত গোঁসাই-বধ পর্ব সুসম্পন্ন না হত তাহলে বঙ্গোপসাগরের সমুদয় জলেও, সত্যেনের সুনামে যে কলঙ্ক কালিমা স্পর্শিত, তার এক কণাও স্খালন করা যেতো না।

বিপ্লবীর পক্ষে দেশপ্রেমে নিষ্ঠার সুনাম যে কত অপরিহার্য ও কত প্রিয় তা কারো অজানা নয়। দেশ-প্রেমিকদের 'সাম্প্রদায়িক' বলে গালাগাল দিলে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠে। অথচ সত্যেন্দ্রনাথ এই দু' দু'মাস পলকে পলকে এর

গুরুত্ব অনুভব করেছেন, রাজসাক্ষী বলে সবাই ঘৃণা, অশ্রদ্ধা করছেন তা বুঝছেন, কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে যাঁরা ধৃত হয়েছেন, যাঁরা অদূর ভবিষ্যতে এই মোকদ্দমায় জড়াতে যাচ্ছেন, তাঁদের কল্যাণের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ বিপ্লবীর একমাত্র অবলম্বন সুনাম, যশ এবং তার সঙ্গে আত্ম-বিসর্জন দিতে একটুও কুণ্ঠিত হননি। সহকর্মীদের প্রাণ তাঁর কাছে কত মহৎ ছিল এ থেকেই বুঝা যায়।

সময়ে দেশের লোক এই কাজে তাঁর আত্ম-ত্যাগের দাম বুঝবে এই ক্ষীণ আশা পোষণ করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক সন্দেহ নেই।

বিপ্লবীদের মধ্যে নেতৃত্বের মোহে কিংবা দলাদলির জন্য সত্যেনের প্রতি তখন যে ঘোর অবিচার করা হয়, তাঁর সুনামে কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত করার জন্য যে মিথ্যা জাল রচনা করা হয়, মনে হয়, আজও তার সমস্তটুকু ছিন্ন হয়নি।

"সত্যেনের সঙ্গে বারীনের ঝগড়া আরম্ভ হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দের গুপ্ত-সমিতির গোড়াতে, সারকিউলার রোডের প্রথম আড্ডা থেকে।......এ সময় বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির সভ্যদের পক্ষে স্বীকারোক্তি বৈধ কি অবৈধ, সেই নিয়ে জেলে আমাদের মধ্যে ঝগড়ার ফলে দুটো দল গ'ড়ে উঠেছিল। এক দলের মোড়ল বারীন, অন্য দলের সত্যেন। বারীনকে তারা দোষারোপ করত।

তারপর এই দোষারোপের মাত্রাটা আরও বেড়ে উঠেছিল, যখন উকীল ব্যারিষ্টার প্রভৃতি সকলে বারীনকে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার ক'রতে পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও তা করলে না। সত্যেন তার প্রতিবাদস্বরূপ নরেনের হত্যায় স্বীকারোক্তি দেয়নি এবং দেবে না ব'লে আগে থেকে নাকি স্থির ক'রে রেখেছিল। বারীন অবশেষে সেসন কোর্টে ব্যারিস্টারদের তাড়ায় স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেছিল; তাতে কিন্তু কিছুই ফল হয়নি। কারণ, শুধু প্রত্যাহারে স্বীকারোক্তির বিষয় যে মিথ্যা, তা প্রমাণ হয় না। স্বীকারোক্তি মিথ্যা বলে ঘোষণা করতে হয়।"

[হেমবাবুর 'বাংলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা' থেকে উদ্ধৃত]

"যাই হোক, এই দলাদলির ফলে বারীনের ওপর অনেকের ভক্তি চটে গেছল। তারা বারীনের নেতৃত্বকে বড় একটা আমল দিত না। এতে তার সমস্ত বিদ্বেষটা গিয়ে পড়েছিল সত্যেনের ওপর। বারীন এই নেতৃত্বের দাবী অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য দু'একবার তুমুল বাগ্-যুদ্ধও করেছিল। তারপর তাকে কিছুমাত্র জান্‌তে না দিয়ে, এত বড় একটা কাণ্ড সত্যেন করল, এতে বারীনের নেতৃত্বের অভিমানে এমনি আঘাত লেগেছিল যে, নরেনের হত্যার পর সেই দিনই আমাদের ২৩নং

ওয়ার্ডে, দস্তুর-মাফিক এক মিটিংএ ব'সে সত্যেনের ওপর দোষারোপের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়ে সন্ত গায়ের জ্বালা কতকটা জুড়িয়েছিল। আর তাকে সামনে না আনতে পেরে, তার উক্ত বন্ধুকে (হেমচন্দ্র কানুনগো মহাশয়কে) দোষ-স্বীকার করিয়ে, ক্ষমা-ভিক্ষা চাইয়ে, আর কখনও এমন কাজ সে করবে না, একথা বলিয়ে তবে ছেড়েছিল। আর সত্যেনের ওপর শোধ নিয়েছিল সে দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়বার পর।

"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোর্টে কিন্তু অতিরিক্ত দেরী হচ্ছে ব'লে নরেনকে এজাহারের পর জেরা করতে হাকিম দেন নি। তাতে আমাদের পক্ষের একজন উকীল অনেক সাধ্য-সাধনায় এই মর্মে একখানি দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন যে, যেহেতু, সাক্ষীকে জেরা করতে দেওয়া হল না, সেই হেতু তার উক্তি তাবৎ প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না, যাবৎ সে আবার যথারীতি সেসন আদালতে সাক্ষ্য দেয় ও জেরা হয়। এই মঞ্জুরীটি না নিলে গোঁসাইকে মারা প্রায় বৃথা হ'ত, আর অরবিন্দ বাবুর মুক্তিও নাকি অসম্ভব হ'ত। তখন বার্লি সাহেবের কোর্টে কোন উকীলই এর আবশ্যকতা বা উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি, তাই রাজী হন নি। এ ফন্দিও সত্যেনের উদ্ভাবিত ও তারই চেষ্টায় হয়েছিল।

"যাই হোক, দুজনেরই ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, কানাই

আপীল করতে রাজী হল না। তাই আগে কানাইর ফাঁসি হল —১০ই নভেম্বর।

"সত্যেনও জান্‌ত, আপীলের ফল কিছুই হবে না; তার মা বিশেষ ক'রে বলা সত্ত্বেও প্রথমে রাজী হয়নি। তারপর আমি তাকে বৈপ্লবিক নিয়ম রক্ষার দোহাই দিয়ে রাজী করিয়েছিলাম। সেজন্যে যে সত্যেনকে লোকমতে নিন্দিত হ'তে হবে, তা ভাবতে পরিনি। বরং তখন মনে করেছিলাম, দেশে সত্যকার গুপ্তসমিতি কখনও হ'লে তারা সত্যেনকে বুঝতে পারবে। কিন্তু সে আশা বৃথা হয়েছে। নরেনকে হত্যার দিন পাঁচ-ছয় পরে আমরাও, সত্যেন কানাই যেখানে আবদ্ধ ছিল, সেই ৪৪ ডিগ্রী নামক জেলখানার মধ্যকার দৃঢ়তর জেলে অর্থাৎ অন্দরমহলে রক্ষিত হয়েছিলাম। বিশেষ কড়াকড়ি পাহারা সত্ত্বেও 'কোডে' মেথরকে দিয়ে চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলত। প্রথমে চেয়ে সেই মেথরের হাতে একটু জল্ খেয়েছিলাম। তাই তার শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিলাম।

"গোঁসাইর মৃত্যুতে সত্যেন কত আশাই করেছিল, কত কথাই সে বলেছিল। কাব্যবিশারদের একটি গানের ভাব নিয়ে লিখেছিল, * অচিরে ভারতের নিশ্চয় "বন্ধন-মোচন" হবে,

---

"প্রকৃত সন্তান হবে সেই জন নিজ দেহ-প্রাণ করি বিসর্জ্জন,
যে করিবে মার বন্ধন-মোচন হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।"

এই বন্ধন-মোচনের কাজে সে "নিজ দেহ-প্রাণ বিসর্জ্জন" ক'রে "মাতৃঋণ প্রতিদান" করছে, এই তার অনন্ত তৃপ্তি।

"কানাইর ফাঁসির পর বিপুল সমারোহে তার দেহ সৎকার করা হয়েছিল। কলিকাতা সহরময় একটা তুমুল আন্দোলন ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। সেই জন্য সত্যেনের ফাঁসির ধার্য্য দিন—২৩শে * নভেম্বর—সাধারণকে জানতে দেওয়া হয়নি। নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি আত্মীয়স্বজনকে ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকবার ও তার মৃত-দেহের সৎকার সেইখানেই করবার হুকুম দেওয়া হয়েছিল।

"য়ুরোপীয়ান ওয়ার্ডাররা ফাঁসির সময় কানাইর নির্ভীকতার কথা আমাদের কাছে বলেছিল। কোর্টে আমাদের কাছ থেকে শুনে সংবাদদাতারা সংবাদপত্রে খুব লিখেছিলেন। সরকার বাহাদুরের পক্ষে তা মোটেই সন্তোষজনক হয়নি। সেই জন্য জেল-ওয়ার্ডারদের যথেষ্ট বকুনিও খেতে হয়েছিল। আর সত্যেনের বেলায় যাতে তার ফাঁসির সময়কার কোন কথা প্রকাশ না হয়, সে জন্য বিশেষ সাবধান করা হয়েছিল। কাযেই ফাঁসির সময়কার সত্যেনের সঠিক খবর অনেক দিন যাবৎ

* সত্যেনের ফাঁসির তারিখ ২১শে নভেম্বর, ২৩শে নভেম্বর নয়

অনেক চেষ্টা করেও আমরা পাইনি। কিন্তু কোন কোন গোরা ওয়ার্ডার, আমাদের জানবার অত্যন্ত আগ্রহ দেখে, কর্তৃপক্ষের মনের মত ক'রে, বিদ্রূপচ্ছলে একটা আধটা কথা বলেছিল, তা বিদ্রূপ ব'লে বুঝতে কারও বাকী ছিল না। পূর্বেই বলেছি, এ সব খবর সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা কোর্টে আমাদের মুখ থেকেই সংগ্রহ করতেন। সত্যেনের বিপক্ষদল এই সুযোগে সত্যেনের সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচার ক'রে তার ওপর সাধ মিটিয়ে শোধ নিয়েছিল। তার মাত্রা এতদূর বেড়েছিল যে, অনেক পরে শুনেছিলাম, সত্যেনকে শোকে মূর্চ্ছিত বা মৃত অবস্থায় ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। তাই সত্যেনের ফাঁসির সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, পরে তাঁদের অনেকের নিকট ব্যাপারটার প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য অনুসন্ধান করেছিলাম। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বিখ্যাত সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়; আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সত্যেনের ফাঁসির দিনে তিনিও জেলখানায় গেছলেন। নিতান্ত হৃদয়হীন ব'লে ফাঁসির ব্যাপারটা নিজে দেখেন নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গীদের ও জেল কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁদের মুখে সত্যেনের ভূয়সী প্রশংসাই শুনেছিলেন। অথচ পরে কোন সংবাদপত্রে তার বিরুদ্ধে অন্যরকম মত প্রকাশিত হয়েছিল দেখে, বিশেষ অনুসন্ধান করেছিলেন, আর জেনেছিলেন আমাদের

মধ্যে অত্যন্ত বাড়া-বাড়ি রকমের দলাদলি ছিল। তার ফলেই সত্যেনের বিপক্ষদলের দ্বারা এই রকম মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।"

[বাঃ, বিঃ, প্রচেষ্টা

শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন, এমন একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের একখানা চিঠি এখানে দেওয়া হ'ল।

২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিয় ব্রজেনবাবু,

প্রশান্ত বাবুর নিকট শুনিলাম আপনি সত্যেনের জীবনী লিখিতেছেন—শুনিয়া খুব সুখী হইলাম। সত্যেনের জীবনী অনেক আগেই বাহির হওয়া উচিত ছিল।......

ইতিপূর্বে আমি হেমবাবুর নিকটও এই সম্পর্কে একখানা পত্র দিই। আমি যাহা জানি, আপনার কাছেও তাহাই লিখিতেছি।...

সত্যেনের ফাঁসির হুকুম প্রকাশিত হইবার পর আমি ও স্বর্গীয় প্রেমতোষ বসু মহাশয় প্রিভি কাউন্সিলে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করিতে মনস্থ করিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি আলু-পোস্তার ইজারাদার স্বর্গীয় আনন্দমোহন পালের সহিত পরিচিত করিয়া উক্ত আপীলের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে

অনুরোধ করিলেন। একদিনের মধ্যে পোস্তার আড়তদারেরা আনন্দ বাবুর হস্তে ৩০০৲ টাকা প্রদান করিলেন। ইঁহাদের উৎসাহের কথা কি বলিব? পোস্তাবাজারের সংলগ্ন একটি গন্ধ-বণিকের দোকানে উপস্থিত হইয়া মনে হইয়াছিল যে এখানে ॥০ আনা পাওয়া গেলেই যথেষ্ট হইবে। দোকানদার ২৫৲ টাকা আমাদের হস্তে দিয়া বলিল, আপীল চলিলে' সে আরও ২৫৲টি টাকা দিবে। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। লর্ড মর্লেকে আমাদের ইংরাজ এটর্নি, ফাঁসি-স্থগিতের জন্য তার করিলেন। উত্তর আসিল, ফাঁসি স্থগিত থাকিতে পারে না।

সত্যেনের দাদা জ্ঞানবাবুর ১০৪ ডিগ্রী জ্বর। সত্যেন্দ্রের সৎকারের জন্য কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। সত্যেন্দ্রের মাতা সজল-নেত্রে আমাকে আসিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমাকেই এই কাজ করিতে হইবে।" দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে কানাইয়ের ফাঁসি হইয়া গিয়াছিল; ও তাহার মৃতদেহ লইয়া কালীঘাট শ্মশানে বিশেষ demonstration হইয়াছিল। তজ্জন্য সত্যেন্দ্রের মৃতদেহ বাহিরে নীত হইতে গবর্ণমেণ্ট অনিচ্ছুক হইলেন। আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ বোম্পাস সাহেবের নিকট গিয়া উহা জেলের মধ্যেই দাহ করিতে অনুমতি লইতে হইল। হুকুম হইল ১৩ কিংবা ১৪ জনের অধিক লোক জেলের মধ্যে যাইতে পারিবে না। মৃতের কোন স্মৃতিচিহ্ন—চুল, নখ, অস্থি

বা চিতাভস্ম বাহিরে আনা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। উক্ত সকল সর্ত্তে সম্মত হইয়া ফাঁসির দিনে প্রত্যুষে ছয়টার পূর্ব্বে আমি, প্রেমতোষ বাবু, সত্যেনের খুড়তুতো ভ্রাতৃদ্বয় ও কতিপয় বন্ধু কাষ্ঠাদিসহ আলিপুর Central জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম। আমরা ফাঁসি দেখিতে চাই কিনা জেলের কর্ত্তৃপক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন। উহা দেখিতে আমরা অসম্মতি প্রকাশ করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে ফটকের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম। অচিরে একজন সশস্ত্র শ্বেত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন যে, "You can go now. The thing is over. Satyendra died bravely. Kanai was brave, but Satyendra was braver." তদ্দণ্ডেই একজন সার্জ্জেণ্ট বলিতে লাগিল, "When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake. When said, "Satyendra, be ready," he answered, "Well, I am quite ready," and smiled. He steadily walked to the gallows. He mounted it bravely, and bore it all cheerfully—a brave lad!" মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি ও আমার পত্নী দুইদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। খুব সহাস্যবদনে দুই দিনই আমাদের সহিত সে স্বদেশী কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল, তাহার কিছু কিছু উক্তি আমার মনে আছে। সে বলিয়াছিল, আমার বা কানাইয়ের মৃত্যু

কি ছার ? আমাদের মত শত সহস্র মরিলে তবে দেশ উদ্ধার হইবে, তবে দেশে জাগরণ আসিবে। আমি তাহাকে ফাঁসির বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিতে অনুরোধ করি। সে কিছুতেই রাজী হয় নাই, তাহার মাতার ইচ্ছা বারবার বুঝাইলে তখন সে বলে, ভাবিয়া দেখিব। পরে জেল হইতে তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করে মাকে সুখী করিবার জন্য। মাতার সাক্ষাৎ ইচ্ছা জানাইলে বলিয়াছিল, "যদি তিনি এখানে আসিয়া না কাঁদেন তবেই সাক্ষাৎ করতে পারি, নচেৎ নহে।" তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার দৃঢ়া জননী এক ফোঁটাও অশ্রু পরিত্যাগ করেন নাই। মাতাকে বলেছিলেন, "মা, আমার মৃত্যু তোমাকে বড়ই আঘাত করিবে প্রাণে জানি, কিন্তু তীর্থে গেলে লোকে সর্বপ্রিয় ফলটি ভগবানকে দান করিয়া আসে। সেইরূপ দেশের জন্য তোমার সর্ব-প্রিয় সন্তানকে দান করিলে এই মনে করিয়া প্রাণে সান্ত্বনা লাভ করিবে। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রার্থনা করিবার জন্য আমি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করি। তিনি তাহা সমাপন করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যায় তাহার অংশ ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিলে সে ঈষৎ হাসিয়া ইসারায় জানাইয়াছিল, "হাঁ।"

তখনকার বালক-বালিকারা নানাস্থানে কানাই ও সত্যেন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিয়াছিল। এই সংবাদ আমি কারাগারে

সত্যেন্দ্রকে দিয়াছিলাম। শুনিয়া তাহার মুখ খুব উৎফুল্ল হইয়াছিল।

তাহার cell-টি বাঘের পিঁজরার মত একদিকে রেলিং ও অন্যদিকে দেওয়াল। আন্দাজ ৪ হাত লম্বা ও ততটা চওড়া। শীতকালে, সত্যেন্দ্রের পরিধানে কম্বল ও তাহাতেই শয়ান। ঘরের এক কোণে পিচ আচ্ছাদিত একটা বাঁশের চুবড়ি—তাহাই কমোডের কার্য্য করিত ও ঐ ঘরেই সত্যেন্দ্রকে খাইতে হইত। উক্ত কমোডটি বিছানা হইতে আন্দাজ দেড় হাত দূরে অবস্থিত। কড়া পাহারার মধ্যে কথা কহিতে হইয়াছিল। পুলিস ব্যতীত জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ইমারসন উপস্থিত থাকিতেন। দাহকালে ঐ ভদ্রলোক প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একখানা চেয়ারে বসিয়া ঐ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। অনেক শিষ্টাচার ভদ্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিদায় কালে আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করিয়া বলিয়াছিলেন, "এইরূপ অবস্থা নিচয়ের মধ্যে আশা করি আপনাদের সঙ্গে এই জেল প্রাঙ্গণে আর যেন কোনও দিন দেখা না হয়।"

আমরা সত্যেন্দ্রের কোনই স্মৃতিচিহ্ন আনিতে পারি নাই। তখনকার Empire পত্রিকাতে যে বিকৃতি সংবাদ বাহির হইয়াছিল আমি তাহার প্রতিবাদ ছাপাইয়াছিলাম।

বশম্বদ

এ, সি, রায়।